Vol. 44 | No. 1 | 2000

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের নাটকে গ্রামীণ জীবন

Volume	44
Issue	1
Year	2000
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শিখা সরকার
Published online	October 1, 2000
DOI	10.62328/sp.v44i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i1.6
Pages	75-102
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশের নাটকে গ্রামীণ জীবন

শিখা সরকার *

বাংলাদেশের নাটকের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে গ্রামীণ জীবন। এর কারণ কিছুটা ভৌগোলিক। নদীবিধৌত পূর্ববাংলায় গ্রামের সংখ্যা বেশি। তাই এ দেশের সাহিত্যে পরিপ্রেক্ষিত ও বিষয়-ভাবনায় প্রাধান্য পেয়েছে গ্রাম। স্বাধীনতার পূর্বে ইব্রাহীম খাঁ, জসীমউদ্দীন (১৯০৩-৭৬), আজিমউদ্দীন আহমদ (১৯০৪-১৯৭৩), আ ন ম বজলুর রশীদ (১৯১১-১৯৮৬), আনিস চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯০), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১), আসকার ইবনে শাইখ, সাঈদ আহমদ (জ. ১৯৩১) এবং স্বাধীনতার পরে সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আলদীন, মামুনুর রশীদ প্রমুখ নাট্যকারের অধিকাংশ নাটকের পটভূমি গ্রাম। জীবনানুভবের বাস্তবনিষ্ঠাই তাঁদের বাংলাদেশের বৃহত্তর গ্রাম জীবনের অন্তর্গত মানব প্রবাহের বিচিত্র সংঘাতদীর্ণ জীবন ও অস্তিত্ব সমগ্রের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। বাঙালি সংস্কৃতির শিকড় অন্বেষণ করলে, ফিরে যেতে হবে গ্রামে। প্রাচীন যুগে রচিত চর্যাপদ, মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, পুঁথিসাহিত্য বাংলার গ্রামীণ জীবনের চালচিত্র। আধুনিক যুগে নাগরিক সভ্যতার বিকাশের মাঝেও কবি তাঁর নিসর্গ চেতনায়, কথা-সাহিত্যিক চরিত্র সংস্থাপনে গ্রামের পটভূমিকে আশ্রয় করেন। রবীন্দ্র সাহিত্যও অনেকাংশে গ্রামনির্ভর। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> গ্রামকেন্দ্রিক সাহিত্যের মধ্যে বাঙালী মানস নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেছে অন্য কোথাও তার তুলনা মেলে না।[১]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার সমাজ-কাঠামো ছিল গ্রামভিত্তিক। গ্রামের অর্থনীতি ছিল প্রধানত কৃষি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে প্রভাব ফেলে তা ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পূর্বে কর আদায় করত জমিদাররা। ভূমি স্বত্বের ওপর জমিদারের কোন মালিকানা ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমি বংশানুক্রমে জমিদারদের হাতে চলে যায়। জমিদারি ব্যবস্থার কারণে কৃষক-সমাজ হলো জমিদারের অধীনস্থ প্রজা। চিরস্থায়ী ব্যবস্থার আওতায় দীর্ঘদিনের বিরামহীন শোষণে, নির্যাতনে, নিপীড়নে গ্রাম-বাংলার কৃষক জনসাধারণের অর্থব্যবস্থা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। তারা ক্রমশ পরিণত হয় ভূমিহীন দিনমজুরে।

শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এলেও গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সনাতন। নানা ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের অভিঘাতেও এর তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

---

* প্রভাষক, বাংলা, নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী।

গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে আধুনিকতা সে-অর্থে প্রসার লাভ করেনি। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে এই চিত্র খুবই নৈরাশ্যজনক। এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ছিল সনাতন ও পশ্চাৎপদ।

ইংরেজ সাম্রাজ্য নীতির কয়েকটি অনিবার্য পরিণতি নতুন সামন্ততন্ত্রের বিকাশ, ধনতন্ত্রের অভ্যুদয় এবং হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণ। সেই সঙ্গে রাজছত্র হারিয়ে মুসলমান সমাজের পশ্চাৎমুখিতা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> সামন্ত হিন্দু বা মধ্যবিত্ত হিন্দু পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে সংস্কারমুক্ত আধুনিক সমাজ নির্মাণে এগিয়ে এসেছিল। অন্যদিকে পরাজিত মুসলমানের অভিজাত সামন্ত সম্প্রদায় গ্রামে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে।[২]

পশ্চাৎমুখিতার কারণে মুসলমান সমাজ আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরে পুরাতন মূল্যবোধকে। প্রাচীন সংস্কার ও ধর্মীয় অনুভূতি গ্রামের মুসলমানদের ঠেলে দিয়েছে আরো অন্ধকারে। শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বাধা দিয়েছে গ্রামের মোল্লা শ্রেণী।

ইব্রাহীম খাঁ তাঁর *কাফেলা* নাটকে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন।[৩] গ্রামের শিক্ষিত যুবক আমজাদের উচ্চশিক্ষিতা আধুনিক স্ত্রী, যে গ্রামের লোকের কাছে সায়েব বৌ নামে পরিচিত, চেয়েছে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াতে। কিন্তু মেয়েরা স্কুলে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ হলেও ফতোয়াবাজরা তাদের ধর্মের দোহাই দিয়ে ঠেকাতে চেয়েছে। তাদের মতে, এ ধর্ম-বিরুদ্ধ কাজ :

> আমাদের মেয়েদের জন্য ওসব স্কুল-টিস্কুলের কিছু দরকার নেই। সোজা কথা এই, আমাদের বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষেরা যা করেনি, আমরা তা করে জাহান্নামে যাবনা। [পৃ.২২]

শিকদার সাহেবের ভাষায় : "এদের স্কুলে পাঠানো শরার খেলাফ কাজ।" [পৃ.২২৫]। এদেরই প্ররোচনায় একদিন রাতে স্কুল ঘরে আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু এত কিছুর পরেও সায়েব বৌ তার সংকল্পে অটল :

> বিশ্বাসের প্রদীপখানি আমার বুকের এক নিভৃত কোণে জ্বেলে নিয়ে যাত্রা শুরু করব— বাইরের অবিশ্বাস উপহাসের ঝঞ্ঝা সে দীপ শিখার কাছে ঘেষতে পারবে না। [পৃ.২৩৩]

অশিক্ষা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন গ্রামটাকে গ্রাস করেছে রোগ-ব্যাধি আর মহামারী। দরিদ্র মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত মানবেতর জীবন কাটায়। সায়েব বৌ এদের রোগশয্যার পাশে গিয়ে সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পরের কল্যাণে তার এভাবে নিজেকে উৎসর্গ করা দেখে মুনশী, শিকদারেরও চৈতন্য হয়। তারাও চায় তাদের স্ত্রীদের স্কুলে পাঠাতে :

> শিকদার : ... এখন এই বুড়ীদের জন্য একটা আলাদা করে মক্তব করে দাও দেখি।
>
> খালেদ : ওস্তাদ মা তো তাই বলেছিলেন। কিন্তু তিনিই যে চলে যাচ্ছেন। [পৃ.২৫৪]

সায়েব বৌ যাচ্ছেন আরেক কর্মবীরের কর্মযজ্ঞকে সফল করে তুলতে। এ কর্মবীর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহা (১৮৯৬-১৯৭১)। তাঁর ভূয়াপুর আগমন উপলক্ষে ইব্রাহীম খাঁ এ নাটক রচনা করেন।[৪]

উদ্দেশ্যমূলক এ নাটকে তিনি দেখিয়েছেন, গ্রামের নিরক্ষর মানুষ জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে প্রতারিত হয়। ভণ্ড নেতাদের চরিত্রও এখানে তিনি উন্মোচন করেছেন। তোষামোদকারী চাটুকার শ্রেণীর লোকদের চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে নাট্যকার বিভিন্ন পাখির নাম ব্যবহার করেছেন : শালিক মিঞা, বগা মিঞা, প্যাচা, ঘুঘু প্রভৃতি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নাটকটি শিল্পগুণসম্পন্ন না-হলেও সমসাময়িক সমাজের বাস্তব চিত্র অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তির ব্যয়ভার বহন করতে গ্রামের সাধারণ মানুষ সর্বহারায় পরিণত হয়। ভিটে মাটি আশ্রয় ছেড়ে এক মুঠো ভাতের জন্য পাড়ি জমায় শহরে। যুদ্ধের বিশৃঙ্খল অর্থনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে কালোবাজারি টাউট ফড়িয়া গোষ্ঠীর জন্ম হয়। এরাই পরবর্তীকালে গ্রামীণ সমাজের নব্য প্রধান হিসেবে আবির্ভূত হয়। কারণ তখন পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ধসে পড়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর জমিদারি প্রথার বিলোপ করা হয় ১৯৫০ সালে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের ছবিও ওই সময়ের বেশ কিছু নাটকে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ইব্রাহীম খাঁর *ঋণ পরিশোধ* (১৯৩৩) নাটক।[৫] কবিরপুরের 'চদ্রীসাব' ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের শেষ পুরুষ। আর্থিক সংকট সত্ত্বেও জমিদারের আভিজাত্যের অহংকারটুকু যায়নি :

> শোন গয়ারাম—শোন বকাউল্লা আমি চাই কবীরপুরের চদ্রীরা গরীব হয়ে গেছে, এ কেউ বলতে চায় বলুক—হাজার বার বলুক—কিন্তু কবীরপুরের চদ্রীরা ছোট হয়ে গেছে, এ যেন এ দেশের কেউ একবারও বলতে না পারে। [পৃ.১৭৬]

খাজনা দেবার পয়সা না-থাকলেও তিনি লঙ্গরখানা চালাবার হুকুম দেন; অতীত স্মৃতি রোমন্থনে জমিদারের পরম সুখ। একসময় খাজনার জন্য তাকে ছোটবোনের স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারস্থ হতে হয়। পরের অনুগ্রহে লেখা-পড়া শিখে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেও নিজের অতীতকে ভুলতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই ছাত্রের প্রতি তার কোন সহানুভূতি নেই। বরং লেখা-পড়া ছেড়ে তাকে ক্ষেতে কাজ করার পরামর্শ দেন। গ্রামের লোকদের তিনি সাদরে গ্রহণও করেন না। তার এহেন আচরণকে বিদ্রূপ করে তার সহপাঠী স্কুল মাস্টার মুনীর বলেছে :

> ইউনিয়ন বোর্ড হতে শুরু করে কাউন্সিল পর্যন্ত, আদালতের কেরানীর টেবিল হতে শুরু করে লাট সাহেবের মন্ত্রীর দফতর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্তরে তোমরা কেউ সবেতনে কেউ অবেতনে নিজেদের অধিষ্ঠিত করে রেখেছ আর সেই ক্ষমতার শিখর হতে তোমরা যারা দেশের আসল সেই দরিদ্রদের অহরহ উপেক্ষার কষাঘাত করেছ; অথচ তাদের কাঁধে কাঁঠাল ভেঙে তোমাদের কোন দিন শরমও হয় নাই, সঙ্কোচও হয় নাই। [পৃ.২০৯]

ডেপুটি ফয়জুর রহমান অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তবে এই চরিত্রটির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকলেও নাট্যকার তা গ্রহণ করেননি। সুবিধাবাদী, স্বার্থপর মানুষ কতভাবে সমাজে নিজের সুবিধাটুকু আদায় করছে নাট্যকার এটাই তুলে ধরেছেন।

ডেপুটি ফয়জুর রহমান গ্রামকে অবহেলা করলেও আসকার ইবনে শাইখের *পদক্ষেপ* (১৯৫২) নাটকের শহীদ ডাক্তার হয়ে গ্রামে ফিরে এসেছিল, গ্রামকে উন্নত করে তুলবার জন্য।[৬] শহীদের বাবা সালাম সাহেব জমিদার জাফরের জ্ঞাতি ভাই। জমিদার বংশের একজন হয়েও তিনি কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিয়ে করেছেন সাধারণ গ্রাম্য পরিবারে। পিতার মৃত্যুর পর শহীদ মানুষ হয়েছে জমিদার জাফর চৌধুরীর কাছে। জমিদারের কাছে মানুষ হলেও পিতার আদর্শ অনুসারী ছিল সে। তাই শ্রেণীবৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে সে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করতে চেয়েছে। জমিদারির উত্তরাধিকারী জাফর চৌধুরীর ছেলে আহসানেরও জমিদারির প্রতি কোন মোহ নেই। বরং এর থেকে মুক্তি পাবার আশায় সে দিন গোনে।

তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি আহসান, তপন, শহীদ এরা সবাই স্বপ্ন দেখে শোষণমুক্ত সমাজের। সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও শোষণ বন্ধ হয় না। গ্রামের অসহায় মানুষ শোষিত হয় মৌলবী, মোড়ল বা চক্কোত্তিদের মত বণিক শ্রেণীর দ্বারা। গ্রামের দরিদ্র লোক জলিল ভাত দিতে দেরি হওয়ায় রাগের মাথায় তার স্ত্রীকে তালাক দিলে ফতোয়বাজ মৌলবী ফতোয়া জারি করে যে জলিলের সঙ্গে তার স্ত্রীর তালাক হয়ে গেছে। এখন তাকে অন্যের সঙ্গে নিকাহ্ দিয়ে কিছুদিন ঘর করার পর তালাক হলে, তবেই সে তাকে গ্রহণ করতে পারবে। জলিল এ নিয়ম অগ্রাহ্য করে।

গ্রামে আধুনিক শিক্ষার প্রসার যাতে না ঘটে সেজন্য মৌলবাদীদের দল গ্রামে স্কুলের পরিবর্তে মাদ্রাসা করার কথা বলে। তাদের মতে,—মাদ্রাসা খোলা হলে ইসলামের কাজ হবে। আখেরাতের কাজ হবে। মুখে তারা ইসলামের কথা বললেও ব্যভিচারের চরমে পৌঁছাতে এদের কোন দ্বিধা নেই। দরিদ্র মানুষের গহনা বন্ধক রেখে চড়া সুদে ধার দেয়। মোড়লের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে পরস্ত্রীর ওপর। চক্কোত্তি গ্রামের একজন শীর্ষস্থানীয় হয়েও "কৈলাসের মেয়ে শতদলকে অপহরণ করতে চেয়েছিল। এসব স্বার্থবাদী লোভী কুচক্রীদের বিরুদ্ধেই শহীদের সংগ্রাম।" আধুনিক সমাজমনস্ক নাট্যকার ভণ্ড সমাজপতিদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এই নাটকে।

আসকার ইবনে শাইখের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক *বিরোধ*।[৭] আভিজাত্যের অহংকারকে কেন্দ্র করে গ্রামের দুটি পরিবারের বিরোধ নিয়ে এ নাটকের কাহিনী। আহমদ সাহেব এবং আজিজ সাহেবের মধ্যে এক সময় বন্ধুত্ব থাকলেও এখন জমিদারি নিয়ে দুজনের মধ্যে মামলা চলছে। মামলা চালাবার মত অবস্থা আহমদ সাহেবের নেই। তবু প্রখর আত্মসম্মানবোধ ও আভিজাত্যের মিথ্যা মোহের কারণে তিনি কিছুতেই আজিজ সাহেবের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন না। শেষপর্যন্ত উভয়ের পুত্র-কন্যার বিবাহের মধ্য দিয়ে দুই বন্ধুর মামলার নিষ্পত্তি ঘটে। অবিন্যস্ত কাহিনী এবং অতি নাটকীয়তার কারণে নাটকটি শিল্পসফল হয়ে ওঠেনি।

আসকার ইব্‌নে শাইখের *বিদ্রোহী পদ্মা* (১৯৫৩), *বিল-বাওড়ের ঢেউ* (১৯৫৫) প্রভৃতি নাটকে গ্রামীণ জীবনের চিত্র পাওয়া যায়।[৮] পদ্মার তীরে বসবাসরত রহমত সরদার, ঈশান নমদাস, অর্জুন কৈবত্য, রফিক মাস্টার পদ্মার চরে ফসল ফলায়। কিন্তু ধান কাটার সময় হলেই শোষক জমিদারের নায়েব আর লেঠেলরা বাধা দেয়। চরের ধান নিজের গোলায় আনার জন্য জমিদার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

বাধিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করে। কিন্তু রফিক মাস্টারের প্রচেষ্টায় হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে সকল বাধাকে প্রতিহত করে। গ্রামের মেয়ে সুধাকে অপহরণ করে জমিদার তার বাগানবাড়িতে রেখেছিল। সংঘবদ্ধ কৃষকরা ধান এবং সুধাকে একই সঙ্গে উদ্ধার করে। পদ্মার ক্ষুব্ধ গর্জনের মত সম্মিলিত জনতার গর্জন নিষ্ক্রিয় করে দেয় জমিদারের বন্দুককে। পদ্মার বিদ্রোহী রূপের মধ্যে নাট্যকার খুঁজে পেয়েছেন এর কূল ঘেরা মানুষের প্রকৃতি, যাদের সমাজ-জীবনের ভাঙাগড়ার পালা পদ্মার কূল ভাঙা-গড়ার সঙ্গে তুলনীয়। পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি যে কত গভীর তাও এ নাটকে স্পষ্ট।

সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারের কারণে নাটকটি হয়েছে আরো জীবনধর্মী। এ-নাটক প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন :

> মানব জীবনের বৃহত্তর আদর্শের দিকটি তাঁহার অধিকাংশ নাটকে সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়াছে। জমিদারশাসিত বাংলাদেশের নিখুঁত সমাজ-জীবনের পরিচয় আসকার ইবনের নাটকে যেমন পাওয়া যায় অন্যত্র তাহা দুর্লভ। জমিদারের অত্যাচারে লাঞ্ছিত সাধারণ গ্রামবাসীর দুঃখ-বেদনাকে নাট্যকার তাঁহার নাটকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন।[৯]

বিল বাওড়ের ঢেউ আসকার ইবনে শাইখের ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। নাটকটি জেলে সম্প্রদায়ের বঞ্চিত, নিঃস্ব ও সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস। যুগ যুগ লালিত কুসংস্কার, সামন্ত সমাজের অসংগতির ছবি এঁকেছেন নাট্যকার। এ নাটকে সামন্ত শ্রেণীর প্রতিভূ নিতাই দাস। সমস্ত জেলে সম্প্রদায় তার ওপর নির্ভরশীল। কারণ বিল ইজারা রাখতে টাকা দেয় নিতাই দাস। আবার বেড়জালও তার। এজন্য মাছের ব্যবসায় যেটুকু লাভ হয় তার খুব সামান্যই থাকে জেলেদের। চিরাচরিত এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ জানায় সহদেব। কিছু লেখাপড়া জানায় সে বুঝেছে নিতাই দাসের সাহায্য ছাড়া যদি তারা এক সঙ্গে কিছু করতে পারে তবেই জেলেদের ভাগ্যের পরিবর্তন আসবে। নদী তাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক বলে তারা গঙ্গাপূজা করে। এ প্রসঙ্গে অনার্য সমাজের প্রকৃতি পূজার কথা স্মরণীয়। সহদেবের পরামর্শে গঙ্গাপূজা উপলক্ষে দুটো দল হয়ে যায়। নিতাই দাসের প্রাক্তন নায়েব মহিম সরকার জেলেদের সমবায় করবার পরামর্শ দেয়। কিন্তু নিতাই দাসের কৌশলে গ্রামের মানুষ সমবায়ের জন্য সংঘবদ্ধ হতে পারে না। তার চক্রান্তে সহদেব সম্পর্কে কুৎসা রটে। রাগে-দুঃখে-অভিমানে সহদেব গ্রামের বিল বাওড় ছেড়ে পাড়ি জমায় দূর নদীতে। গ্রামের ভাষায় যার নাম বাউসী। বাউসীতে মাছ মারতে গিয়ে সহদেবের ভাই নকুল আর ফিরে আসেনি। তাই সহদেবের বাবা তাকে ছাড়তে ভয় পায়। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে সহদেব চলে যায়। নিতাই দাসের মেয়ে গৌরীর বিয়ে ঠিক হয়। সে সময় সহদেব ফিরে আসে এবং তার কৌশলে গৌরীর বিয়ে ভেঙে যায়। নিতাই দাস বাধ্য হয় সহদবের সঙ্গে গৌরীর বিয়ে দিতে। এ বিয়েতে সহদেবের শর্ত একটাই, বিয়ের যৌতুক হিসেবে দিতে হবে সমবায় সমিতি করার সুযোগ। সহদেবের এই শর্ত সানন্দে মেনে নেয় নিতাই দাসের ছেলে গৌরীর দাদা নরু।

নিতাই দাস প্রাচীন সংস্কারপন্থী এবং ধনতান্ত্রিক সমাজকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু নতুন প্রজন্ম মানুষের সম অধিকারে বিশ্বাসী।

নাট্যকারের সমবায় ভাবনার প্রতিফলন *শেষ অধ্যায়* নাটকের মধ্যেও লক্ষ করা যায়।[১০] নাটকের রচনাকাল ১৯৫৩ হলেও তা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭০ সালে। এখানে দেখান হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পতন এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের উত্থান। নাটকের প্রধান চরিত্র জমিদার বংশের শেষ পুরুষ রেজা সাহেব। অর্থের প্রতাপ কমে গেলেও জমিদারি আভিজাত্যকে এখনও তিনি সদম্ভে প্রকাশ করেন। গ্রামের উঠতি ধনী রুস্তম ব্যাপারী একদিন তাঁদের বাড়িতে কাজ করত। রুস্তম ব্যাপারীর জামাই কারখানার মালিক। জমিদারের নিজস্ব লেঠেল এখন ব্যাপারীর দেহরক্ষী। কারখানায় গ্রামের কৃষকদের শ্রম কাজে লাগাতে চায় রুস্তম ব্যাপারী। এবং তাদের জমি নিজে কিনে নিতে চায়। বাদ সাধে হেলাল। হেলাল রেজা সাহেবের পুত্র। হেলালের মা জরিনা সাধারণ ঘরের মেয়ে হওয়ায় তাকে গাজী পরিবার পুত্রবধূর স্বীকৃতি দেয়নি। এমনকি রেজা সাহেব শিশু হেলালকে খুন করবার জন্য তাঁর বিশ্বস্ত চাকর আরফানের হাতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু আরফান জমিদারের অজান্তে এ শিশুকে বড় করে তোলে।

পিতৃপরিচয় হেলালের কাছে অজানা। জরিনা স্কুল শিক্ষয়িত্রী। তারই আদর্শে গড়ে উঠেছে হেলাল। সে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে চায়। ব্যাপারীর জামাই হেলালের ঘর পুড়িয়ে দেয়। হেলাল জানতে পারে তার পিতৃপরিচয়। পুত্রের জন্য ব্যাকুল হলেও জমিদার রেজা সাহেব বংশগৌরব ও লোকলজ্জার ভয়ে তা প্রকাশ করতে পারেন না। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকে প্রবল। হেলাল জমিদার বাড়ি ছেড়ে তার মাকে নিয়ে চলে গেছে, কারণ এই অভিশপ্ত বাড়ির প্রতি তার কোন মোহ নেই।

নাটকে হেলালের মধ্যে সমবায় ভাবনা কাজ করলেও আসকার ইবনে শাইখের অন্য দুটি নাটকের মত তা ততটা প্রখর নয়। অন্য দুটি নাটকে সংঘবদ্ধ হবার যে প্রচেষ্টা দেখা যায় এখানে তা অনুপস্থিত। নাটকে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে।

বংশগত অহংকার কিভাবে জমিদারের ধ্বংসের কারণ হয় তা নিয়ে মুনীর চৌধুরীও লিখেছেন *ঢাক* নাটক।[১১] *শেষ অধ্যায়* -এর রেজা সাহেবের মত এ নাটকে জমিদার হায়দার সাহেব তার বড় ভাইয়ের একমাত্র সন্তান খালেদকে জমিদারির প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে অস্বীকার করেন। কারণ খালেদের অপরাধ তার মা জমিদার বাড়ির এক সাধারণ আশ্রিতা। যার বংশ মর্যাদার আভিজাত্য নেই। জমিদার বাড়িতে একটি পুরাতন ঢাক আছে যেটা মানুষের চামড়া দিয়ে তৈরী। একটি বালক সীমান্তে পাহাড়া দিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই অপরাধে তার পিঠের চামড়া দিয়ে ঢাক তৈরি করা হয়। জমিদারের অমানবিক অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ এই ঢাক আপনা থেকেই বেজে উঠে ঐ পরিবারের প্রথম সন্তানের মৃত্যু সংকেত ঘোষণা করে। এই সংস্কার যুগ যুগ ধরে জমিদার বাড়িতে চলে আসছে। একদিন আমিন নামের গ্রামের এক সহজ সরল ছেলে ঢাকটি বাজাতে যায় কিন্তু ঢাক আপনা থেকেই বেজে ওঠে। হায়দার সাহেব এ শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন নিজের মৃত্যু আশঙ্কায়।

তিনি খালেদকে তার অধিকার ফিরিয়ে দিতে চান। কিন্তু সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যু হয় খালেদের। রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনীর মত সেও মরে প্রমাণ করল, এ বাড়ির প্রকৃত উত্তরাধিকারী সে। ঢাকের শব্দ জমিদারের মিথ্যে অহংকারকে ভেঙে দিল। এখানে ঢাক হচ্ছে জমিদারের অন্যায় অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ দীর্ঘকাল প্রবাসে কাটালেও তাঁর নাটকের কেন্দ্রে আছে বাংলাদেশের গ্রাম। তাঁর প্রথম নাটক *বহিপীর* (১৯৫৫)।[১২] মানুষের আজন্ম লালিত পুরনো সংস্কারের ভিতকে নাড়া দিয়েছেন তিনি এ নাটকে। বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে পীরের ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রতি মানুষের প্রচণ্ড আস্থা। তারা ভক্তি নতচিত্তে পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে পীরদের অসামান্য প্রভাব। এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে পীরদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এঁদের অসংখ্য মুরিদ। এ নাটকের প্রধান চরিত্র বহিপীর বই-এর ভাষায় কথা বলে।

দরিদ্র ধর্মভীরু মানুষ বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে পুণ্য অর্জনের তৃপ্তি পেতে চেয়েছে। কিন্তু নতুন প্রজন্ম জীবনের বাস্তববাদিতায় বিশ্বাসী। প্রথাবাদী জীবনের চেয়ে প্রাণের ধর্ম তার কাছে বড়। তাই বৃদ্ধ পীরকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ না করে তাহেরা বিয়ের রাতে বাড়ি ছেড়েছে। পথে ডেমরার ঘাটে সে আশ্রয় পায় রেশমপুরের জমিদার হাতেম আলীর বজরায়। পরে ঘটনাচক্রে পীরও এই বজরায় আশ্রয় নেয়। নাটকের শুরু এবং শেষ এই বজরাতে। তাহেরা বহিপীরের স্ত্রী জানতে পেরে জমিদার গিন্নী খোদেজা তাকে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে বলেন। পুরনো মূল্যবোধে বিশ্বাসী খোদেজার কাছে পীরের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা সৌভাগ্য :

> পীর মানুষ স্বামী ক-জনের কপালে জোটে ? কত বড় কপাল তোমার মা, সেকথা একবার সত্যি ভেবে দ্যাখ। [পৃ. ১৩]

পীরের সঙ্গে এই বজরায় তার স্ত্রীর মিলন হলে তাদেরও সোয়াব হবে। এই আশায় পীরের কথার অন্যথা করতে ভয় পান তিনি। কিন্তু জমিদার পুত্র হাশেম এর প্রতিবাদ জানায়।

সামন্তযুগীয় চিন্তা, মতাদর্শ ও সংস্কারের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার দ্বন্দ্ব এ-নাটকের মূল উপজীব্য। বহিপীর, জমিদার হাতেম আলী এবং তার স্ত্রী খোদেজা পুরাতন সমাজব্যবস্থার প্রতীক। আর হাশেম এবং তাহেরা সংস্কারমুক্ত আধুনিক জীবনবোধের প্রতীক। হাশেম গ্রাজুয়েট সুতরাং তার মধ্যে এ জাতীয় মানসিকতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহেরা গ্রামের হলেও আত্মসচেতন। *লালসালু*র (১৯৪৮) জমিলার পরিপূর্ণ রূপ তাহেরা। তার চরিত্রে আছে প্রখর আত্মসম্মানবোধ। পীরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য জমিদার তনয় হাশেম তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। তার যুক্তি হলো :

> ... একজন ঝোঁকের মাথায় কেবল বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য যদি কাউকে বিয়ে করতে চায় তবে সে অত সহজেই মত দেবে কেন ?

কিন্তু যখনি সে জানল, সে পীরের কাছে ফিরে গেলে হাতেম আলীর জমিদারি রক্ষা পাবে তখন সে পীরের সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে। আশ্রয়দাতার প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতার কারণে এটা তার পক্ষে সম্ভব। রক্ষণশীল সামন্তবাদী সমাজের মানুষ জমিদার হাতেম আলী তার জমিদারি টিকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু হাশেমের কাছে পুরনো মূল্যবোধের চেয়ে বর্তমানের দাবি অনেক বেশি। তাই জমিদারি বাঁচানোর কোন রকম চেষ্টা না-করে সে তাহেরাকে নিয়ে নতুন জীবনের পথে পাড়ি দেয়। এভাবে প্রাচীন সংস্কারের ভিতে আঘাত করেছেন নাট্যকার।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় নাটক *তরঙ্গভঙ্গ*।[১৩] এখানেও নাট্যকারের বিদ্রোহ ধর্মের লেবাসধারীদের বিরুদ্ধে, যারা প্রতিনিয়ত এদেশের দরিদ্র অসহায় মানুষগুলোকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিয়েছে। নাট্যকারের গভীর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা উন্মোচিত হয়েছে ভণ্ড প্রতারক ধর্মব্যবসায়ীদের মুখোশ। গ্রামের এক দুখী মেয়ে আমেনা। তার চার-চারটে সন্তান। কিন্তু তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন যোগাবার ক্ষমতা নেই তার। তার স্বামী রোগশয্যায় মরণাপন্ন। পেটে এক ফোটা ওষুধ পড়ে না। কাজ চাইতে গেলেও কেউ তাকে কাজ দেয় না। এই নিঃস্ব অনাহারী মেয়েটির অবস্থার সুযোগ নেয় মৌলবী নেওলাপুরী। সে তাকে সন্তান হত্যায় প্ররোচিত করে।

কোলের সন্তানকে বুকে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে আমেনা। কিছুদূর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত গলা টিপে সন্তানকে হত্যা করে।

স্বামীর কষ্ট সইতে না পেরে তাকেও ধুতুরার বিষ দিয়ে হত্যা করে আমেনা। যে মৌলবী নেওলাপুরী তাকে হত্যা করতে প্ররোচিত করে, সেই আবার তাঁর বিরুদ্ধে স্বামী ও পুত্র হত্যাকারী বলে আদালতে অভিযোগ তোলে। এ নাটকের জজ সাহেব বুঝতে পারেন আমেনার জীবনের এই পরিণতির পেছনে কোন কুঁচক্রীর মন্ত্রণা কাজ করেছে।

এক সময় ভিখারিনী ও মতলুব আলীর সাক্ষ্য-প্রমাণে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়, এ কু-কার্যের সহায়ক মৌলবী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী। কিন্তু সত্যানুসন্ধানী বিচারককেও এক সময় হার মানতে হয়। মৌলবীর জয় হয়। গ্রামের লোক আমেনাকে পিটিয়ে হত্যা করে। তবে স্বামী-পুত্রকে হত্যা করার অনেক আগেই আমেনার মৃত্যু ঘটেছে। তাই কোন ফরিয়াদ সে জানায় না। শেষ পর্যন্ত জজেরও মৃত্যু হয়েছে। এ-সমস্ত ঘটনাই ঘটে স্বপ্ন-দৃশ্যের অতিবাস্তব আবহে। এই প্রতীক নাটকের মধ্যে নাট্যকার দেখিয়েছেন, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কিভাবে পরাজিত হচ্ছে সমাজের কুচক্রী প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে। এ অবস্থার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে এ নাটকে। নাটকের শেষ দৃশ্যে চাপরাশির সংলাপ সেই ইঙ্গিত বহন করে : " সেই মান্ধাতার আমলের জিনিস না বদলালে আর চলবে না।" [পৃ. ১২০]

ভিখারিণী একটি প্রতীকধর্মী চরিত্র। নীলিমা ইব্রাহিমের ভাষায়—'জাগ্রত চেতনা'। তার পোষাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । গতানুগতিক ভিখারিদের মত সে নয়। অনেকটা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মত। জীবনযুদ্ধে অবসন্ন, বিপর্যস্ত মানুষের জীবনের করুণ পরিণতি সে দেখেছে। সমাজের শঠ, ভণ্ড,

প্রতারকদের মুখোশ উন্মোচন করাই তার উদ্দেশ্য। এ নাটকেও পীর আছে। তার নাম বারিশপীর। জজ সাহেব তার মুরিদ হলেও সে নেওলাপুরীর সমগোত্রীয়। এজন্য নেওলাপুরীকে সে সমর্থন জানিয়েছে।

শহরের আদালতে নাটকের দৃশ্যপট নির্মিত হলেও নাটকের সংলাপ এবং চরিত্র-চিত্রণ, বিষয়-ভাবনা গ্রামের। পুকুরের ধার, করিমউদ্দিনের ক্ষেতের পাশ, আমিরউদ্দিনের বাঁশঝাড়, গ্রামের জঙ্গল, বাঁশের ডগায় বসে কাক ডাকা—এসব গ্রামীণ জীবনের চিত্র। নিরীক্ষাধর্মী এ নাটক সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> তরঙ্গভঙ্গ নাটকে সময়ের প্রবাহকে অপসৃয়মান না ভেবে জীবন সত্যের ভিত্তিভূমি হিসেবে নাট্যকার পরীক্ষা করেছেন।[১৪]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আরেকটি নিরীক্ষাধর্মী নাটক *উজানে মৃত্যু*।[১৫] এটাও গ্রামনির্ভর। একজন নৌকাবাহক তার স্ত্রী ও তিন ছেলেকে হারিয়ে জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত। তার দিন কাটছে মৃত্যুর অপেক্ষায়। স্ত্রী পুত্রদের অসুখে তার অর্ধেক জমি গেছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ জমির ওপর নির্ভরশীল। বিপদের দিনে তারা জমি বন্ধক দেয়। বাকি অর্ধেক জমি তলিয়ে গেছে বন্যার পানিতে। এভাবে ভূমিহীন নিঃস্ব কৃষক ক্লান্ত অবসন্ন জীবনের দাঁড় টেনে চলেছে। উড়ন্ত বালি হাঁস তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে প্রবহমান জীবনের দিকে, যেখানে অফুরন্ত প্রাণের উৎস। বালি হাঁসের সুর্যের দিকে উড়ে যাওয়া—এই প্রতীকী অর্থকে প্রকাশ করে। নাটকের সাদা পোশাক ও কালো পোষাক পরিহিত ব্যক্তি যথাক্রমে জীবন ও মৃত্যুর প্রতীক। মৃত্যু লোকটির জন্য কষ্টদায়ক। কারণ সে দেখেছে মৃত্যুর ভয়াবহতা।

নাটকের নামকরণের ক্ষেত্রে সামলোচকের বক্তব্য :

> যে মৃত্যু স্বাভাবিক পথে আসে না, আসে কষ্টকর উজান পথে—বালিহাঁস যেমন উত্তপ্ত সূর্যের দিকে উড়ে যায় তেমনি করে। তাই এ মৃত্যু উজানে মৃত্যু।[১৬]

নাটকের বিষয়ভাবনায় গ্রামীণ জীবন স্পষ্ট। নৌকাবাহক, সাদা পোষাক পরিহিত ব্যক্তি এবং কালো পোষাক পরিহিত ব্যক্তি চিন্তাচেতনায় প্রতীকী হলেও নদীমাতৃক গ্রাম-বাংলার পটভূমিকায় লালিত। নাটকের উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নাট্যকার গ্রামীণ সমাজকে আশ্রয় করেছেন। 'যেমন নারকেলের ছোবড়া', 'জিবটাও কলাগাছের মতো ফুলে উঠেছে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি যথার্থ :

> ... কোথাও বাস্তবকে অতিক্রম করেনি, বরং বাস্তবের অন্তরশাঁসকে ছেঁকে তুলেছে। আশ্চর্য সংযত সংহত নিরুত্তেজ গভীর গম্ভীর তাঁর রচনা। তাঁর ভিত্তি বাস্তবতায় কিন্তু দুর্গের শীর্ষে পাখির মতো, তাঁর উড়াল কোনো গহীন প্রতীকতায়।[১৭]

আইউব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণের পর ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আরও প্রসার লাভ করে। স্ফীত হতে থাকে ধনিক শ্রেণী। গ্রামে উত্থান ঘটে কিছু ঠিকাদার মহাজনের। এসব টাউট সুযোগ-

সন্ধানী কালোবাজারি ও সুদের কারবার করে বিপুল অর্থের পাহাড় জমায়। আসকার ইবনে শাইখের নাটকে এ জাতীয় কিছু গ্রাম্য মহাজন আছে। *আওয়াজ* নাটকের চকদার এরকম একজন মহাজন।[১৮] জিনিস বন্ধক রেখে গ্রামের মানুষকে ধান দেয়। রাতের অন্ধকারে সীমান্ত দিয়ে ধান পাচার হয়ে যায়। কিন্তু সম্পদের পাহাড় গড়ে তুললেও চকদার সাহেবের মনে অশান্তি।

চকদার চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখাতে পারতেন নাট্যকার। চরিত্রটি হতে পারত একটি অসাধারণ নাটকীয় চরিত্র। গ্রামের শিক্ষিত যুবক রশীদ গ্রামের তরুণ রমুকে ক্ষেপিয়ে তোলে চকদারের বিরুদ্ধে। রমুর ব্যক্তিগত আক্রোশকে কাজে লাগায় রশীদ। রমুর বাগদত্তাকে চকদার তার ছোট বৌ করে ঘরে তুলেছে। গ্রামের লোকজন কন্ট্রোল দরে ধান নেবার জন্য চকদারের বাড়ি আসে। গোলায় অতিরিক্ত ধান মজুত রাখার কারণে প্রকিউরমেন্ট অফিসার তদন্ত করতে আসে।

আসকার ইবনে শাইখের *প্রতীক্ষা* নাটকেও গ্রামের প্রেসিডেন্ট খানাতল্লাশীর ভয়ে নিজের কিছু ধান হাসান মাস্টারের গোলায় রাখতে চেয়েছিল।[১৯] কিন্তু আদর্শবান মানুষ হাসান মাস্টার প্রেসিডেন্টের এই অন্যায় প্রস্তাবে রাজি হয়নি। তার সংসারের অভাব হার মেনেছে তার আদর্শের কাছে।

আনিস চৌধুরীর *মানচিত্র* (১৩৭০) নাটকটি এক দরিদ্র স্কুল মাস্টারের ব্যর্থ জীবনের কাহিনী।[২০] মাসের পর মাস বেতন বন্ধ থাকায় দরিদ্র স্কুল মাস্টার মজিদ সংসার চালাতে অক্ষম হয়ে পড়েন। ইচ্ছে সত্ত্বেও স্ত্রী-পুত্রের সামান্য আবদারটুকুও পূরণ করতে পারেন না। নিম্নমধ্যবিত্ত স্কুল মাস্টারের ঘরণী মরিয়মের মনেও সাধ নেই। দারিদ্র্যের যাঁতাকলে পড়ে স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে সে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত কারণে শিক্ষক বঞ্চিত হয় তার প্রাপ্য সম্মান থেকে। হেডমাস্টার ইয়াকুব নিজের অবস্থানকে আরো পাকাপোক্ত করার জন্য স্কুলের বেতন থেকে শিক্ষকদের বঞ্চিত করে সে টাকায় স্কুল সেক্রেটারিকে খুশি করে। স্কুল সেক্রেটারি জমিদার ইয়াকুব একজন অর্থলোভী পিশাচ। অনেকটা *জমীদার দর্পণ* (১৮৭৩)-এর হায়ওয়ান আলীর মত। শিক্ষার প্রতি তার কোন সম্মান বোধ নেই। এদের চক্রান্তে মজিদের চাকুরি চলে যায়। মুদির দোকানে কাজ করেও সে পেয়েছে অসম্মান আর অবহেলা। এই মর্যাদাহীন বঞ্চিত জীবনের গ্লানি পরিচিত সমাজে বয়ে বেড়ানো তার জন্য ছিল আরো কষ্টকর। তাই এর থেকে মুক্তি পেতে তাকে পা বাড়াতে হয় শহরের পথে।

নাট্যকার সমাজচিত্র তুলে ধরলেও তাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেননি। তবে সমকালীন গ্রামীণ জীবনের চিত্র রূপায়ণে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ সম্পর্কে সমালোচক যথার্থ বলেছেন :

> ... আমরা প্রথম আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র' নাটকে আমাদের বাস্তব মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিফলন খুঁজে পেলাম ... সেখানে রয়েছে গ্রাম্য স্কুল শিক্ষকের বেড়ার বাড়ী ঘর, মঞ্চে আমরা আমাদের পরিচিত সংসার চিত্রগুলো খুঁজে পেলাম, সেই লাউয়ের ডগা, সেই ইলিশ মাছ, আদরের বেড়ালটি, আর মুসলমান সমাজের প্রচলিত পরিচিত মামাতো ভাইবোনের সলজ্জ মধুর প্রণয়দৃশ্য। শুধু তাই নয় ঐ নাটকে আমরা আমাদের অতি পরিচিত স্কুল মাস্টার, তার রুগ্ন স্ত্রী আর স্কুলের সেক্রেটারী, ইউনিয়ন

> বোর্ডের প্রেসিডেন্টকেও দেখতে পেলাম। ... এই প্রথম আমরা মঞ্চে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা ও হতাশার রূপায়ণ দেখতে পেলাম।[২১]

মজিদ মাস্টারের জীবনে গভীর হতাশার চিত্র অঙ্কন করলেও জীবন সম্পর্কে নাট্যকার আশাবাদী। তাই শেষ অবধি মাস্টারের বড় ছেলে আমিন চাকুরি পায়, গড়ে তোলে সচ্ছল সংসার। রানু-কামালের বিবাহিত জীবন সুখের হয়। পারু বৃত্তি পায়। এভাবে নতুন প্রজন্মের সফলতার মধ্য দিয়ে নাট্যকার জীবনকে আশাব্যঞ্জক করেছেন।

আদর্শ শিক্ষকের লাঞ্ছিত ও অপমানিত জীবনের ইতিকথা নিয়ে আজিমউদ্দীন আহমদ লিখেছেন *মা* নাটক।[২২] আলিনগর কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ আলম গড়তে চেয়েছিলেন একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিজে দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন বলে তার জীবনের স্বপ্ন ছিল নিঃসহায় ও নিঃসম্বল মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় না উপাধ্যক্ষ ও ক্যাশিয়ারের চক্রান্তে। তারা দুজনে মিলে কলেজের টাকা আত্মসাৎ করে সমস্ত অপবাদের ভাগী করে অধ্যক্ষকে। অথচ অধ্যক্ষ আলম ছিলেন সৎ এবং মানুষের ওপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ'—রবীন্দ্রনাথের এই কথাকে যিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, জীবন যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত সেই শিক্ষকের মুখে একদিন উচ্চারিত হয় নির্মম সত্য :

> যে বাজারে চল্‌ছে টাকার খেলা, সে বাজারে শিক্ষক আর কুকুর সমান। তার মূল্য নেই, মান নেই ইজ্জৎ নেই। তাঁকে বাঁচতে হবে উচ্ছিষ্ট খেয়ে পা চেটে, আর তার সঙ্গে নিতে হবে জাতিকে গড়ে তোলার সমস্ত দায়িত্ব। [পৃ. ১৮]

শেষপর্যন্ত স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে তাঁকেও শহরে পাড়ি জমাতে হয়েছে। যখন তদন্ত করে আসল সত্য প্রকাশ পেল, তখন তিনি সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। এটাই শিক্ষকের জীবনের ট্র্যাজেডি। *মানচিত্র* নাটকের মজিদ মাস্টারও শহরে ছেলের বাড়িতে এসে বুঝেছিলেন—যুগের পালে পরিবর্তনের বাতাস লেগেছে, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে ছোট পরিবার গড়ে উঠেছে। এখানে শ্বশুরের জায়গা নেই।

ফররুখ শিয়রের *সামনের পৃথিবী*[২৩] নাটকে পল্লি জীবনের অত্যাচার-অনাচারের ছবি আছে। গ্রামের ধনী ব্যক্তি আলহাজ দবির উদ্দিন পয়সার জোরে পাতপুকুরের নামকরণ করেছেন দবিরগঞ্জ আর নামের আগে বসিয়েছেন সৈয়দ। ডাকাতি, চুরি ইত্যাদি মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে তিনি গ্রামের সত্যনিষ্ঠদের পথ থেকে সরালেন। ঘরে আগুন দিতে, অন্যের মাথায় লাঠি মারতে, অন্যের কন্যাকে ছলে বলে ঘরে তুলতে হাজি সাহেবের এতটুকু সংকোচ নাই। চরিত্রগুলোর মধ্যে নাট্যকার জীবনের এক নির্মম বাস্তবতা উদ্‌ঘাটন করেছেন।

সমাজ-সচেতন এ নাট্যকারের *ব্ল্যাকমার্কেট* উল্লেখযোগ্য নাটক।[২৪] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষে কালোবাজারি, মজুতদারদের চরিত্র আলী মনসুরের (জ. ১৯২৫) *পোড়োবাড়ী*তে নিঃসঙ্গ জমিদারের অন্তর্বেদনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।[২৫] গ্রামের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের প্রতি জমিদার-তনয় অরুণের সহানুভূতি। অরুণের কণ্ঠে শোনা যায় মানবতার জয়গান :

ওরা ধর্মের নামে করে ভণ্ডামি। ... রহিম কাকা, আপদে বিপদে আমাদের এখানে ছুটে এসেছে, গ্রামের জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তার কাছ থেকে পায় উপকার ... মাটির পুতুল ভেঙে ফেলে জীবন্ত এই দেবতাগুলোকে যদি পূজা করতাম তো অনেক পেতাম মা...। [পৃ. ৫৬]

নাট্য-ভাবনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অনুসারী হলেও সাঈদ আহমদ পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন বাংলাদেশের গ্রামকে।[২৬] তাঁর *কালবেলা* নাটকের পটভূমি ১৯৬১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। *কালবেলা* প্রথমে ইংরেজি ভাষায় 'দ্য থিং' নামে লেখা হয়। পরে বজলুল করিম কর্তৃক ভাষান্তরিত হয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত মাসিক *পরিক্রম* -এ (২য় বর্ষ একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ১৯৬৩ এবং ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৩) প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬এর জুলাই-এ বাংলা একাডেমী সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক *কালবেলা, মাইল পোস্ট* ও *তৃষ্ণায়* এক সঙ্গে প্রকাশ করে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের গ্রাম থেকে সংযোজিত হয়েছে *কালবেলা* নাটকের চরিত্র। মোড়ল, ঢুলি, উনেন, উপেং, কুমারী মেয়ে শিষদার বংশীধারী এরা সবাই গ্রামের মানুষ।

তাঁর *মাইল পোস্ট* নাটকটিও প্রথমে ইংরেজিতে (১৯৬২-৬৪) রচিত হয়েছিল।[২৭] পরে আতউর রহমান একে বাংলায় অনুবাদ করেন (১৩৭৬) পত্রিকায়। এ নাটকে মা-এর মধ্যে যে নস্টালজিয়া কাজ করেছে তা গ্রামের।

প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে প্রচলিত লোক ঐতিহ্যবাহী বহু গাথা, গান, পালা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) *মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, The Folk Literature of Bengal* প্রভৃতি গ্রন্থে। এসব লোককাহিনীকে নাটকে রূপ দিয়েছেন জসীমউদ্‌দীন, আজিমউদ্দীন আহমদ, আসকার ইবনে শাইখ, আ.ন.ম. বজলুর রশীদ প্রমুখ নাট্যকার। লোক-উপাদানে সমৃদ্ধ এসব নাটকে বাংলার গ্রামীণ জীবন, সংস্কৃতি তার ঐতিহ্য যতটা স্পষ্ট ততটা আর কোথাও নেই। এ প্রসঙ্গে সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

লোকজীবন এবং লোকমানস, লোকগাথা ছড়া-রাখালি গান সংগ্রহ করে আধুনিক শিল্পের পরিমার্জনায় এগুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যে অভিনব যোজনা।[২৮]

জসীমউদ্‌দীন তাঁর *পদ্মাপার* (১৯৫০) নাটকটি বহু প্রচলিত জনপ্রিয় লোককাহিনী 'মোনাই যাত্রা' অবলম্বনে লিখেছেন।[২৯] নাট্যকারের স্বীকারোক্তি হচ্ছে :

আমার পদ্মাপার নামক লোকনাটকখানিতে কতকটা মোনাইযাত্রা লোকনাট্যের অনুসরণ করিয়াছি।[৩০]

এটি রূপক-আধ্যাত্মিক নাটক। মোনাই সওদাগর সুজন মাঝির নৌকায় চড়ে বাণিজ্য করতে যায়। আসলে পরম ঈশ্বরকে পাবার যে দুর্গম পথ সেই পথই মোনাই-এর যাত্রাপথ। এ পথে মানুষ এবং অবশেষে অনেক কষ্ট স্বীকারের পর তার পরম আরাধ্যকে পায়। নাটকের মধ্যে নাট্যকার বাংলা বাউল, মারফতি, দেহতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যাগুলোকে সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। নাটকের সংলাপ অধ্যাত্মজীবন চেতনাশ্রয়ী।

মদনকুমার আর মধুমালার জনপ্রিয় লোককাহিনীকে কেন্দ্র করে জসীমউদ্‌দীন লিখেছেন *মধুমালা* (১৯৫৬) লোকনাট্য। জনপ্রিয় লোকসংগীতের দ্বারা নাট্যকার দৃশ্যগুলিকে এক সূত্রে গেঁথেছেন। রূপকথার বিচিত্র রসাবেদন সৃষ্টি ছিল নাটকের মূল লক্ষ্য। তবে নাটকে গ্রামের আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে তিনি শুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করেছেন।

জসীমউদ্‌দীনের দ্বিতীয় লোকনাট্য *বেদের মেয়ে*[৩১] (১৯৫১) উত্তরবঙ্গে প্রচলিত 'হুমরা বাইদ্যা' লোককাহিনী অবলম্বনে রচিত। পূর্ব-বাংলার বেদে জীবনের বাস্তবচিত্র পরিস্ফুট হয়েছে এ নাটকে। বেদেরা যাযাবর, তারা নদী পথে গ্রামে গ্রামে সাপের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। নৌকার উপরে তাদের ঘর-সংসার। জীবিকার প্রয়োজনে যেতে হয় লোকালয়ে। বেদেনিরা মাথায় ঝুপড়ি নিয়ে নানান রকম জিনিসপত্র বিক্রি করে। নাটকের বেদেনি চম্পা তার স্বামী গয়া বাইদ্যার সঙ্গে সাপ খেলা দেখাবার সময় চম্পার উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে গ্রামের মোড়লের। চম্পাকে না-পেলে মোড়ল বেদেদের নৌকা জ্বালিয়ে দেবে, এই জন্য বেদে সমাজকে বাঁচাতে চম্পা মোড়লের বাড়িতে থেকে যায়। বেদের দল ফিরে যায়। চম্পা ভুলতে পারে না তার বেদেকে। একসময় যখন মোড়লের মোহ কেটে যায় তখন বেদের ঘরে নতুন সঙ্গিনী। যে স্বামী, যে সমাজের জন্য চম্পা আত্মত্যাগ করেছিল সেই স্বামী তাকে ভুলে যাওয়াতে চম্পার কাছে জীবন হয়ে গেল অর্থহীন।

জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ চম্পা সাপে-কাটা স্বামীর বিষ নামাতে গিয়ে নিজেই মৃত্যুকে বরণ করে। স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি। আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে চম্পা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে যেন গ্রাম বাংলার চিরন্তন বিরহিনী নারী। অন্যদিকে মোড়ল, মোড়লের স্ত্রী, গয়া বেদে প্রভৃতি চরিত্র স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

জসীমউদ্‌দীনের আরো একটি লোকনাট্য *পল্লীবধূ*। নাটকটি ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হলেও রচিত হয়েছে অনেক পূর্বে। নাটক রচনার পেছনে ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গ্রাম-জীবনের পটভুমিকায় নাটক লিখবার জন্য উৎসাহিত করেছেন।[৩২] নায়ক আজীম কোলকাতা থেকে এম.এ.পাশ করে গ্রামে এলে তার পিতা গ্রামের মোড়ল ছদাম তার আপ্যায়নে যে অতিরঞ্জন দেখায় তা শহরের শিক্ষিত ছেলের কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। ছেলে বাবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেও বাবা মনে করে এ লেখাপড়া জানার ফল। বাল্যবন্ধুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলে আজীম বেঁকে বসে। কিন্তু হাসিনার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে সে সিদ্ধান্ত বদলালেও হাসিনার বাবা এ বিয়েতে রাজি হয় না। নাটকের পরিণতি অবশ্য মিলনান্তক। পল্লিবালা হাসিনা লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি। গ্রামের আঞ্চলিক সংলাপ ব্যবহারের কারণে নাটকটি হয়েছে আরও জীবনঘনিষ্ঠ।

জসীমউদ্‌দীন বেশ কিছু একাংকিকা লিখেছেন। *বদল বাঁশী, করিম খাঁ বাড়ী, গ্রামের মায়া, গাজন চরের কাইজা* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জসীমউদ্‌দীনের নাটকের বৈশিষ্ট্য গীতিময়তা। বাংলার ঘরে ঘরে যে লোক-গাথাগুলো জনপ্রিয় তার মধ্যে সংগীতের আধিক্য। গ্রাম-বাংলার মানুষের সংগীতপ্রিয়তার কারণে জসীমউদ্‌দীন সংগীতকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

'ধোপার পাট' পালাগান থেকে কাহিনী নিয়ে নাট্যকার আজিমউদ্দীন ১৯৬২ সালে লিখেছেন লোকনাট্য *কাঞ্চন*। ধোপার মেয়ে কাঞ্চন আর জমিদার পুত্র নন্দকিশোরের প্রেম নাটকের মূল উপজীব্য। কাহিনীতে প্রচুর নাটকীয় উপাদান থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার তার সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। কাঞ্চনের প্রেম উপেক্ষা করে নন্দ কিশোর রাধা নামে অপর এক জমিদার কন্যাকে বিয়ে করে। এতে মনোকষ্টে কাঞ্চন আত্মহত্যা করে। এরপর নন্দকিশোরের আত্মিক দ্বন্দ্ব বা অনুশোচনা দেখানোর সুযোগ থাকলেও নাট্যকার তা গ্রহণ করেননি। নাটকীয় দ্বন্দ্বের অভাবে নাটকটি সার্থক হতে পারেনি। আজিমউদ্দীন আহমদের আরো দুটি লোকনাট্যের একটি *মহুয়া*, অন্যটি *চন্দ্রাবতী*। দুটি নাটকের কাহিনীই *মৈমনসিংহ গীতিকা* থেকে সংগৃহীত। *মহুয়া* নাটকের কাহিনী বেদের মেয়ে আর ব্রাহ্মণ জমিদারের প্রণয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। নাটকের পরিণতি ট্র্যাজিক। চন্দ্রাবতী মধ্যযুগীয় মহিলা কবি। জয়ানন্দ নামের এক যুবককে ভালোবেসে তাঁর জীবনেও নেমে আসে করুণ পরিণতি। এখানেও নাট্যকার নাটকীয় উপাদানকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হননি। জনপ্রিয় দুটি কাহিনী পরিবেশনই ছিল নাট্যকারের মূল লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্যটি স্মরণীয় :

> নাটকে চরিত্রসৃষ্টি, কাহিনী-নির্মাণে সংযম প্রদর্শন এবং সর্বোপরি অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের ঘাত প্রতিঘাত সৃষ্টি অপেক্ষা নাট্যকার একটি সুপরিচিত ও প্রচলিত লৌকিক রোমান্টিক প্রেম কাহিনীকে ফ্রেমবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন মাত্র।[৩৩]

মৈমনসিংহ গীতিকার 'দেওয়ানা মদিনা' পালাকে কাব্যনাট্যে রূপ দিয়ে আ.ন.ম. বজলুর রশীদ রচনা করেন *ধনুয়া গাঙের তীরে*।[৩৪] *মৈমনসিংহ গীতিকার* জনপ্রিয় চরিত্র মদিনা সম্পর্কে ফরাসি সাহিত্যিক রোমা রোঁলা মন্তব্য করেছিলেন :

> I was specially delighted with the touching story of Modina which although only two Centuries old, is and antique beauty and purity of centiment which art has rendered faithfully.[৩৫]

স্বামীর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা বাংলার চিরন্তন পতিপ্রাণা বধূ রূপটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জমিদারতনয় দুলাল মদিনাকে তালাক দিয়ে চলে যাবার পরে অভিমানে বেদনায় ধনুয়ার তীরে ঘুরে ঘুরে শেষপর্যন্ত মদিনা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অনুতপ্ত দুলাল ক্ষমা ভিক্ষার জন্য মদিনার কাছে ফিরে এসে তার সমাধির পাশে বসে বিলাপ করতে থাকে। নাট্যকার দুলালের অন্তর্বেদনাকে কাব্যে রূপ দিয়েছেন।

লোকগাথা অবলম্বনে নাট্যকারের আরো দুটি কাব্যনাট্য *কোন এক দীপক সন্ধ্যায়* এবং *মেহের তোমার নাম*। এই তিনটি কাব্যনাট্য একত্রে 'ত্রিমাত্রিক' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে।

'দেওয়ানা মদিনা'কে কেন্দ্র করে আসকার ইবনে শাইখও নাটক রচনা করেছেন।[৩৬] তার *দেওয়ানা মদিনা* নাটকটি সংক্ষিপ্ত। নাটকের শুরুতে দেখা যায়, বয়াতী মদিনার মাযারের পাশে বসে দুলাল-মদিনার গল্প বলে চলেছেন। এরপর ধীরে ধীরে মূল নাটকের পট উন্মোচিত হয়েছে। এ

নাটকে খণ্ড খণ্ড দৃশ্যে গ্রামীণ জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। ফসল কাটার সময় গ্রামের কৃষক পরিবার কিভাবে আনন্দে মেতে ওঠে, দুলাল-মদিনার কথোপকথনে তা স্পষ্ট ধরা পড়ে।

ক্ষেতের কাজে দুলাল-মদিনা একজন আরেকজনকে সাহায্য করে। তাদের সংলাপে কৃষক পরিবারের গৃহস্থালীর একটি নিপুণ চিত্র পাওয়া যায়। দুলাল চলে যাবার পর মদিনা তার সন্তান সুরুজ আর জামালকে নিয়ে স্বামীর অপেক্ষায় থাকে। কোনদিন শাইল ধানের চিড়া কোটে, কোন দিন পিঠা বানায়—এসবের মধ্যে বিরহিনী পল্লিবধূর রূপটি চমৎকার ধরা পড়েছে। নাট্যকারের ভাষায় :

> এই পল্লী-গাথার প্রতি ছত্রে যে জীবন, যে হৃদয় ধরা দিয়েছে, তা একান্ত পল্লীবাসীর। স্বর্ণকারের কারুকার্য না থাকলেও তা' একবারে খাঁটি সোনা। পল্লীবাসীর সহজ সরল প্রাণ পল্লী-গাথার সহজ সরল কথায় অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হয়ে ধরা দিয়েছে। পল্লী কবিরা তাঁদের মায়ের বোনের মেয়ের, তাঁদের ছেলের, তাঁদের মনের মানুষের প্রাণের কথায় বাঙালী জীবনের অফুরন্ত সুধা ভাণ্ড উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন।[৩৭]

পল্লিবাংলার সহজ সরল রূপের সঙ্গে শহুরে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে নাট্যকারের এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

লোককাহিনী আশ্রয় করে সাঈদ আহমেদ লিখেছেন *তৃষ্ণায়* (১৯৬৬) নাটক। পূর্বে আলোচিত নাট্যকারদের সঙ্গে সাঈদ আহমদের পার্থক্য এখানেই যে, কাহিনী পরিবেশন তাঁর নাটকে মুখ্য নয়। লোককাহিনীর এ চরিত্রগুলিকে তিনি ভিন্ন মাত্রা দিয়েছেন। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন এ কাহিনীকে। এ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয় :

> তৃষ্ণায়-এর উপজীব্য বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোককাহিনী শিয়াল ও কুমীর ছানা গল্পকে নিয়েই। আমার ধারণা কোন রূপকথা বা লোককাহিনী সমকালীন সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করে না যদি সেগল্প সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক বা অর্থবহ হয়ে ওঠে। সে সময়ে দেশ, সমাজ এমনকি উদ্ভূত একটি সমস্যার প্রেক্ষিতে শিয়াল ও কুমির ছানার গল্প আমার কাছে ভীষণ জীবন্ত বলে মনে হয়েছে। এ সমস্যা হলো মানুষের অস্তিত্বের এবং টিকে থাকার সমস্যা। ... শিয়াল পণ্ডিত ও কুমীরের সাতটি ছানাকে আমাদের জীবন-নাট্যের অঙ্গনে আমি যেন এক নতুন ভূমিকায় দেখতে পেলাম।[৩৮]

শোষকের রূপকে সাঈদ আহমদ চিহ্নিত করেছেন ভিন্ন মাত্রায়। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। শোষকশ্রেণী কখনও কখনও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে শোষণের পথ প্রসারিত করে। শেয়ালের চাতুর্যে বোকা কুমীর মা যেমন বিভ্রান্ত হয়, তেমনি তার সাত সন্তানের মধ্যে বেঁচে থাকা একমাত্র সন্তান ফুকরো ভাইদের হত্যার প্রতিশোধের পরিবর্তে শেয়ালের প্রতি অনুগত হয়ে পড়ে। মুগ্ধ হয় তার পাণ্ডিত্যে।

স্বাধীনতা-উত্তর যে-সব নাটকে পল্লি-জীবনের চিত্র পাওয়া যায়, তার মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় সৈয়দ শামসুল হকের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*।[৩৯] মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত এ-নাটকে বাংলাদেশের গ্রামকে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। গ্রামের মাতবর প্রভাবশালী

ব্যাক্তি। বটগাছের মতই গ্রামে তার শক্ত অবস্থান। আশেপাশের সাতটি গ্রাম মোড়লের কথায় ওঠে বসে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রামের মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হলেও, মাতবরের গায়ে কোন আঁচড় লাগে না।

কিন্তু গ্রামবাসীর দৈনন্দিন জীবনের চিত্র বড় করুণ। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সংলাপে তা যেমন জীবন্ত তেমনি বাস্তবনিষ্ঠ :

যদিও নিজের ঘরে ভাঙ্গা চাল দিয়া
পানি ভাইস্যা সারা রাইত হইছে দরিয়া।
মাথায় সুরুজ নিয়া খাড়া দিনমান
নতুন বুনছি ধান
সবুজের বানের লাহান। [পৃ. ২৬]

কিন্তু এত পরিশ্রমের পরও সে ধান কৃষকের ঘরে ওঠে না, কারণ :

হঠাৎ আচমকা
ধানে ধরছে পোকা।
শীষের ভিতরে ধান খোয়ারের ছাই হইয়াছে।
সড়ক সড়ক দিয়া শত শত লাশ নিয়া গ্যাছে।
আর যারা বাঁচা আছে তারা কচুঘেচুর সন্ধানে
আদার বাদাড় ভাঙ্গে। [পৃ. ২৬]

এভাবে দুর্ভাগ্যের শিকার হয় গ্রামের মানুষ। ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল গ্রামবাসী অসুখ-বিসুখে হয় পীরের শরণাপন্ন। অন্যদিকে মাতবরের আশ্রয়ে পীরের অবস্থান শক্ত হয়। রক্ষণশীল পীর নিয়মের অনুশাসনে বেঁধে দেন সহজ সরল গ্রাম্য বালিকার জীবন।

কিন্তু মাতবরের মেয়ের জীবনে ঈমান কারো থেকে কিছু কম ছিল না, তবু তার জীবনে নেমে এসেছে করুণ পরিণতি। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে নাটকের চরিত্র। ভাষা কাব্যময় হলেও তার লৌকিক আবেদন প্রতিটি চরিত্রকে স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত করেছে। সমাজ ও জীবনের অনবদ্য চিত্র ফুটে উঠেছে বিভিন্ন সংলাপে। গ্রাম্যজীবনের উপাদানে রচিত উপমা ও চিত্রকল্পের সুচিন্তিত প্রয়োগ নাটকটিকে করেছে বাস্তবধর্মী ও জীবনঘনিষ্ঠ। মাতবরের মেয়ের সংলাপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে গ্রামের একটি গৃহস্থ পরিবারের সন্ধ্যাবেলা :

গতকাইল সন্ধ্যার সময়?
তখন পুকুর থিকা ফিরা আসছে হাঁস,
নিজ হাতে ঘরে নিছি, খিল দিছি, শিয়াল খাটাস
য্যান নাগাল না পায়। নমাজের শেষে আম্মাজান

উঠানে খাড়ায়া কইল, অরে, আনাজের ডালি আন
রাইত হয়া যায়, হাঁড়ি এখন না চুলায় দিলে পর
খাওয়া-দাওয়া করতে করতে নিশি দু'পহর।
আনাজ কুটতে আছি। একা পাকঘর সুনসান।
হঠাৎ আছাড় দিয়া আসমানে দেখা দিল চান
এক ফালি কদুর লাহান। [পৃ.৪১]

গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত সৈয়দ শামসুল হকের আরেকটি নাটক *নুরলদীনের সারাজীবন*।[৪০] নীল আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হলেও তা সমকালীন জীবনভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। নাটকের সংলাপে তার প্রমাণ মেলে :

সবার অন্তরে মোর অন্তরের অগ্নি জ্বলিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছো,
সবার অগ্নিতে সব সিংহাসনে অগ্নি ধরিতেছে
... ...
আবার বাংলার বুকে জোয়ারের পলি পড়িতেছে।
... ...
আবার নাঙল ঠেলি মাঠে চাষী বীজ বুনিতেছে।
... ...
নবান্নের পিঠার সুঘ্রাণে দ্যাশ ভরি উঠিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছো
নিশীথে কোমল স্বপ্ন মানুষের চোখে নামিতেছে
... ...
হামার ভাইয়ের মুখে ভাই ডাক আছে।
সুখে দুঃখে অন্নপানে সকলেই এক সাথে আছে।
সোনার বাংলার সোনা বাংলাদেশে আছে। [পৃ ১৩৫-৩৬]

আবদুল্লাহ আল মামুনের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক *এখন দুঃসময়*।[৪১] ১৯৭৪-এর বন্যা ও দুর্ভিক্ষের ওপর ভিত্তি করে লেখা নাটকটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৫-এ। বন্যা বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়, প্রতিবছরই বাংলাদেশে কোথাও-না-কোথাও বন্যা হয়েই থাকে। কিন্তু চুয়াত্তরের বন্যার ভয়াবহতা ছিল অনেক বেশি। মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষ যখন আবার নতুন করে বাঁচার প্রেরণা খুঁজছিল, তখনই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিরাট অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। নাটকের প্রথম দৃশ্যে নাট্যকার নোটিশ জারির মত করে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করেছেন : "চালের মন একশ আশি"।... [পৃ.১]

বন্যার পানির সাথে সাথে চালের মন বেড়ে চলে গেছে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এরপর চাল যখন বাজারে দুর্লভ হয়ে উঠল, তখন চিকিৎসকের পরামর্শে বাঙালিকে খাদ্যাভ্যাস ত্যাগ করতে হলো। অর্থাৎ ভাতের পরিবর্তে রুটি। নাটকে গ্রাম-শহর দুটোই পাশাপাশি এসেছে। তবে মূল ঘটনাংশ গ্রামকেন্দ্রিক। দুর্ভিক্ষের শিকার অসহায় গ্রামবাসী ক্ষিদের জ্বালায় নিজেকে বিক্রি করতেও প্রস্তুত। সুযোগ-সন্ধানী কিছু মানুষ বন্যা আর দুর্ভিক্ষকে পুঁজি করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। মুন্সী গ্রামের অসহায় মেয়ে জরিনাকে ভাত খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে তুলে দেয় বেপারীর হাতে। বন্যা জরিনাকে সর্বস্বান্ত করেছে। তার একমাত্র শিশুপুত্র ভেসে গেছে বানের জলে। সৎমা যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল তারও ঘর করতে পারেনি জরিনা। ভালোবেসেছিল সোনা নামের এক চালচুলাহীন যুবককে। ব্যাপারীর নৌকায় আসার পর সোনার সঙ্গে দেখা হয় জরিনার। এ নৌকায় সোনাকে দেখে জরিনা আবার নিজেকে ফিরে পায়। তাই পেটে অসহ্য ক্ষিদে থাকলেও ব্যাপারীর ভাত জরিনার গলা দিয়ে নামে না। সোনার সামনে মনে পড়ে যায় তার স্বপ্নের কথা :

> সোয়ামী আমার হাল গরু লইয়া ক্ষেতে যাইবো—পোলা দিনভর আঙ্গিনা দিয়া দৌড় পারবো আমি দুই চক্ষু ভইরা দেখমু। [পৃ.১৮]

এ স্বপ্ন গ্রামের কৃষক পরিবারের মেয়ের স্বপ্ন। বন্যা জরিনার সে-স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। যখন জরিনা বা সোনাদের স্বপ্ন ভেঙে যায় বন্যার পানিতে, তখন ব্যাপারী বন্যার পানি নিয়েই নতুন করে স্বপ্ন দেখে। পানি বাড়ার সাথে সাথে তার কালোবাজারি ব্যবসাও ফুলে ফেঁপে ওঠে। বন্যায় তলিয়ে যাওয়া জমি জলের দরে কিনে নিতে চায় ব্যাপারী। সোনাকে দেখে যেমন জরিনার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে তেমনি জরিনাকে দেখে সোনাও নতুন করে বাঁচার প্রেরণা পায়। তাই এতদিন ব্যাপারীর অবৈধ কাজের সঙ্গী হলেও এবার সে ব্যাপারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত জরিনার অসহায়তাকে আরো প্রকট করে তুলতে নাট্যকার সোনারও মৃত্যু দেখিয়েছেন।

১৯৭৪ সালের বন্যা এবং দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে শেখ আকরাম আলী (জ. ১৯৩৮) লিখেছেন *লাশ ৭৪*।[৪২] প্রথম দৃশ্যে গ্রামের একটি গোরস্থানে বেওয়ারিশ লাশ কবর দিচ্ছে মীরু ও হাটখোলা গ্রামের দুজন মানুষ। দুর্ভিক্ষে মৃত এ পর্যন্ত মোট দুশো জনকে কবরস্থ করেছে মীরু। এবার যে লাশটি সে দাফন করতে যাচ্ছে তা এক নারীর লাশ। সে সময় সেখানে আসে এক সাংবাদিক এবং জুলমত খাঁ নামের এক পাগল। দুর্ভিক্ষে জুলমত খাঁর পরিবারের সকলে মারা গেলে, তাদের কবরস্থ করতে না পারায় সে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছে। এরপর থেকে সে কেবল গোরস্থানে ঘুরে বেড়ায়। মুনীর চৌধুরীর *কবর* নাটকের মুর্দা ফকিরের আদলে গড়া এ চরিত্রটি। এবারে এই নারীর লাশটি কবরস্থ করার সময় জুলমত খাঁ জাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুললে মৃত নারী কথা বলে ওঠে। দ্বিতীয় দৃশ্যে এ নারীর লাশে পরিণত হবার নেপথ্য কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

এই নারীর নাম সহিদন। তার স্বামী জামশেদ ছিলেন একজন সৎ স্কুল মাস্টার। তাদের একমাত্র পুত্র খোকা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধার পিতা এবং সৎ মানুষ হবার কারণে জামশেদ

মাস্টারকে গ্রামের মানুষ ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে। কিন্তু তার বড় ভাই একাত্তরের ঘাতক দালাল সাধারণ ক্ষমার জোরে আবার স্বমূর্তি ধারণ করে।

হাজী মুকসেদরা তৈরি করে হাসমতদের মত খুনী সন্ত্রাসীদের। হাসমত রিলিফের গমে ভাগ বসাতে চাইলে জামশেদ মাস্টার বাধা দেওয়ায় তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়। সুযোগ বুঝে হাজি মুকসেদ দখল করে নেয় মাস্টারের ঘর-বাড়ি, সম্পত্তি। মাস্টারের হত্যার দায় চাপিয়ে দেয় মুক্তিযোদ্ধা ফারুকের ওপর। এভাবে স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র মুক্তিযোদ্ধাদের সরিয়ে আবার নিজেদের অবস্থানকে শক্ত করে নেয়। মুক্তিযোদ্ধার বোন এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কন্যা ফাতেমাকে লঙ্গরখানায় যেতে হয় খাবার আনবার জন্য। সহিদন মেয়েকে নিয়ে শহরে এসে সর্বস্বান্ত হয়। মেয়েকে হারিয়ে এক মুঠো ভাতের জন্য পথে পথে ঘোরে। যখন ভাতের সন্ধান মেলে তখন গলা দিয়ে নামে না সহিদনের, ভাত গলায় আটকে তার মৃত্যু হয়।

জুলমত খাঁ চরিত্রটি অবিকল মুনীর চৌধুরীর *কবর* নাটকের মুর্দা ফকিরের মত। জুলমত খাঁ এ নাটকে বিবেকের কাজ করেছে। জুলমত খাঁ দর্শক বা পাঠকের চৈতন্যকে জাগিয়ে তোলে।

মামুনুর রশীদের *এখানে নোঙর* নাটকের চেয়ারম্যানও একজন সুযোগ-সন্ধানী মানুষ।[৪৩] নদীর পানিতে তলিয়ে যাওয়া চর যখন নতুন করে জেগে ওঠে, তখন চেয়ারম্যান তহশীলদারকে হাত করে সেটা নিজের দখলে আনার চেষ্টা করে। জব্বার মিয়ার জলমহলও সে একইভাবে দখল করে। গ্রামের মন্টু, হাফিজ, স্কুল মাস্টার সোলায়মান নতুন চর জাগার সন্ধান পেয়ে চলে আসে। ডুবে যাওয়া বাড়িকে অনেক কষ্টে চিহ্নিত করে বুড়ি। আসে হাফিজের বোন সফুরা। কিন্তু চেয়ারম্যানের নির্দেশে ঘুষখোর তহশীলদার বলে আমিন দিয়ে মাপিয়ে তারপর দলিল করে সে সকলকে জায়গা দেবে। আমিন শহরের টাউটবাজদের একজন। চর ডুবে যাওয়ার পর শহরে আশ্রিতা সফুরার উপর তার কুনজর পড়ে। গ্রামে এসে আবার সে সফুরাকে কু-প্রস্তাব দেয়। অন্যদিকে চেয়ারম্যানের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে হাফিজ মন্টুর মত তরুণরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে দূরত্ব বাড়িয়ে তোলে। এরা যাতে সংঘবদ্ধ না হতে পারে সে জন্য এটা চেয়ারম্যানের একটা কৌশল। কিন্তু যে কাজ তারা পারেনি, সফুরা একাই সে কাজ করে দেখিয়েছে। আমিনের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেতে রাতের অন্ধকারে তাকে বটি দিয়ে হত্যা করে প্রতিবাদের রাস্তা দেখিয়েছে সফুরা।

এ নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব দুটোই আছে। নাটকের প্রধান চরিত্র চেয়ারম্যানের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে। জব্বারের জলমহাল কেড়ে নিয়ে তাকে খুন করার পর চেয়ারম্যানও স্বস্তি পায়নি। যখন সে চরে একা হাটে, তখনই জব্বারের অশরীরী আত্মা তার সামনে এসে দাঁড়ায়, দাবি করে তার জলমহাল। এভাবে একসময় নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে চেয়ারম্যান। শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথের সঙ্গে এর একটা গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। ম্যাকবেথও বাঙ্কোকে হত্যা করার পর তার মৃত আত্মাকে দর্শন করে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে।

নাটকে বহির্দ্বন্দ্ব ঘটেছে দুটো শ্রেণীর মধ্যে। একদিকে স্বার্থান্বেষী সুবিধাভোগী মানুষ, অন্যদিকে এদেরই চক্রান্তে বঞ্চিত নিঃস্ব অসহায় মানুষ। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষরা সংগ্রামী হলেও প্রতিবাদী ছিল না। এদের প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়েছে সফুরা। যে কারণে এ নাটকে সফুরার উপস্থিতি ছিল অনিবার্য।

চেয়ারম্যান, তহশীলদার বা আমিনের মত স্বার্থান্বেষী মানুষ বাংলার প্রতিটি গ্রামে আছে। এদের চক্রান্তে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হয় অসহায় মানুষ। এসব লোভী ও প্রতারক চক্রান্তকারীদের নাট্যকার মামুনুর রশীদ ইবলিশ নামে চিহ্নিত করেছেন তাঁর *ইবলিশ* নাটকে (১৯৮২)।[৪৪] গ্রামের মাতবর সিকদার ও ইউনিয়ন রোর্ডের মেম্বার একাব্বরের লক্ষ্য কেবল অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা। টিপ সইয়ের বিনিময়ে মজনু নামের এক গরিব চাষীর ভিটে-মাটি কেড়ে নেয় মাতবর সিকদার। এদের কাছেই ভিটে মাটি বন্ধক রেখে মুক্তিযোদ্ধার পিতা হাশেমকে চলে যেতে হয় শহরে।

শ্রেণী-বৈষম্য গড়ে তুলতে সিকদার বা একাব্বর কেউ চায় না গ্রামের লোক স্বনির্ভর হোক। গ্রামবাসীকে বিলে মাছ মারতে বাধা দেয়, তাঁতি আবদুল্লার কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেয়।

পুরাতন চাষাবাদ পদ্ধতি কখনই অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনবে না এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল রফিক। রফিক শহরে লেখাপড়া করেছে। গ্রামের উন্নয়নের প্রতি তার গভীর আগ্রহ। নাট্যকারের মানস-পুত্র রফিক চায় শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে মানব-সম্পদকে কাজে লাগাতে। এজন্য সে গ্রামের লোকদের তাঁত শিল্পের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। কারণ তার সামনে দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁতি আবদুল্লাহ এবং তার সুখী পরিবার। কৃষকদের যেমন একাব্বর বা মাতবরের করুণার উপর নির্ভর করতে হয়, আবদুল্লাহকে তেমন করতে হয় না। কৃষকরা জমি বন্ধক রেখে সেই টাকা দিয়ে বীজ কিনে সারা বছর কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায়। সুদসহ সেই টাকা শোধ দিতে ফসলের প্রায় সবটাই চলে যায় মাতবরের ঘরে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে তারা রফিকের কথামতো আবদুল্লার কারখানায় যোগ দেয়। একাব্বর আর সিকদারের জমিতে কাজ করার মতো কিষান পাওয়া যায় না। তাদের সব ক্ষোভ গিয়ে পড়ে রফিক আর আবদুল্লাহর তাঁত কারখানার ওপর। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ গ্রামের বিত্তহীন মানুষ তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়। এ কাজে এগিয়ে আসে মেয়েরাও।

তাঁতে বোনা শাড়ি আতশী বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করে। সে এক ভাগ্যবিড়ম্বিত নারী। যৌতুকের দাবি মেটাতে না-পারা স্বামীর সংসারে তার জায়গা হয়নি। একমাত্র সন্তানও চিকিৎসার অভাবে অকালে মারা গেছে। তার পিতা যখন যৌতুকের বালা দেবার জন্য ভিটে-মাটি বন্ধক রাখল, তখন আতশীর স্বামীর ঘরে নতুন বৌ। মিথ্যে বদনামের অপবাদ দিয়ে তারা আতশীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর তার বাবার সর্বস্ব বিক্রির টাকায় গড়া বালা উঠেছে নতুন বৌ-এর হাতে। এভাবে সর্বস্ব খুইয়ে আতশী হয়েছে সর্বহারাদের একজন।

এ নাটকের অন্যতম চরিত্র মুনশী একাব্বর আর সিকদারের শোষণের হাতিয়ার। রোগ-ব্যাধিতে গ্রামের লোকের কাছে মুনশীই ভরসা। মুনশীর পানি পড়া আর ফু-এ তাদের আগাধ বিশ্বাস। ছেলে রফিক মুনশীর চোখে ইবলিশ। উপযুক্ত পুত্র-কন্যা রেখে বৃদ্ধ বয়সে মুনশী বিয়ে করে একটি কিশোরীকে। তার কন্যা রোকেয়ার প্রবল জ্বরে সে তাকে গোলাপ পানি দিয়ে গোসল করায়। জ্বরে অচেতন রোকেয়ার মাথায় পানি দিতে বারণ করে। তার ধারণা, রোকেয়ার শরীরে ইবলিশের দৃষ্টি পড়েছে, তাই তার এ অবস্থা। রোকেয়ার মৃত্যু হলে মুনশীর সর্বক্ষণের সঙ্গী একনিষ্ঠ ভক্ত তালবেলেমের মধ্যে পরিবর্তন আসে। এবার সে মুনশীকে ত্যাগ করে। এতদিনে প্রকৃত ইবলিশদের চিনতে পেরেছে সে। তাই নাটকের শেষ অঙ্কে মেরাজুলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে দেশবাসীর প্রতি তালেবেলেমের আহ্বান :

জাগোরে দেশের মানুষ জাগো, জাগো... [পৃ. ৭১]

এভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনায় নাট্যকার দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন।

যুগে যুগে এদেশের মানুষ শোষিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পরেও যেমন শোষক শ্রেণীর প্রভাব দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেও গ্রামের মাতবর বা প্রধানরা একইভাবে শোষণ করে এসেছে। সেলিম আলদীনের *কেরামত মঙ্গল*-এ কেরামত প্রত্যক্ষ করেছে, প্রত্যেকটি অঞ্চলে শোষক রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে।[৪৫] কেরামতের জন্মস্থান 'নখলা'তে সে দেখে মির্জার বর্বর পাশবিক রূপ। নিজের সম্পত্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে যে গ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়েছে। চন্দ্রকোনায় এসেও সে দেখেছে তালুকদার মির্জারই সমগোত্রীয়। তালুকদারের বাড়ি কাজ করতে গিয়ে নওশাদী হারিয়েছে তার সতীত্ব। অথচ বন্ধ্যা নারীর অপবাদ নিয়ে তাকে স্বামীর ঘর ছাড়তে হয়েছিল। তালুকদার টাকা দিয়ে নিজের অপকর্মকে ঢাকতে চেয়েছে।

এ নাটকের প্রত্যেকটি খণ্ডে কেরামত দেখেছে নিপীড়িত মানবাত্মার করুণ ক্রন্দন। বাল্যকালে সে দেখেছে, ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না-পেরে তাদের গ্রামের ময়না গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরেছে। তার গর্ভজাত সন্তানকে খেয়েছে অসংখ্য লাল পিপঁড়া। নওশাদীর ভ্রূণও বাঁচেনি। একাত্তরের ধর্ষিতা নারী নূরজাহানের গর্ভস্থ সন্তানকে বাঁচাতে চেয়েও বাঁচাতে পারেনি কেরামত। স্বাধীন দেশের মাটিতে শমলার সন্তানও দেখেনি পৃথিবীর আলো। এভাবে মানব শিশুর অপমৃত্যু কেরামতকে যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত করেছে। নির্মম বাস্তবতার মাঝে দাঁড়িয়ে কেরামতের একটাই প্রার্থনা :

আদম সুরত বেবাক মায়ের গর্ভে শান্তি দিক [পৃ. ১৩৪]

গ্রামীণ-জীবন ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে লেখা *কিত্তনখোলা* নাট্যকার সেলিম আলদীনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক।[৪৬] মেলাগামী বিভিন্ন মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের একটি বাস্তব চিত্র। গ্রামের নানা ধরনের পেশাজীবী মানুষ মেলায় এসেছে। তাদের জীবনযাত্রা, তাদের মানসিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় বিধৃত করেছেন নাট্যকার।

কুসংস্কারে আচ্ছন্ন গ্রামের মানুষের অন্ধ বিশ্বাস, তাদের জীবনের নানা দিক প্রতিবিম্বিত হয়েছে নাটকে। ভালুকের নখ নিলে মৃগী রোগী সেরে যাবে এই বিশ্বাসে সোনাই নামের এক গ্রাম্যযুবক এসেছে মেলায়। সোনাই দিনমজুর। উত্তরাধিকার সূত্রে চার বিঘা জমি পেয়েছিল সে। এখন বন্ধক আছে তার জমি। ইদু কন্ট্রাক্টর সে জমি কেনার জন্য প্রস্তুত। সোনার বউ চম্পা দু'বছর আগে প্রথম সন্তান প্রসব করতে গিয়ে অত্যধিক রক্তপাতে মরে যায়। ঘরে তার অসুস্থ মা। তার সঙ্গে এসেছে বছির, পেশায় কলু। কিন্তু ঘানি টানার চেয়ে সারাটা শীতকাল সে তাড়ি খেয়ে, যাত্রা গান আর কবির আসরে খোল বাজিয়ে কাটায়। ইদু কন্ট্রাক্টরকে এই নাটকে প্রতিনায়ক বা ভিলেন বলা যায়। যাত্রা দলের পরিচালক সুবল ঘোষ তার হাতের পুতুল। ইচ্ছের বিরুদ্ধেও বনশ্রী বালার মত যাত্রা দলের প্রথম সারির অভিনেত্রীকে ইদু কন্ট্রাক্টরের সামনে নাচ দেখাতে হয়। ইদু সম্পর্কে নাট্যকারের বক্তব্য:

> ইদু যেন জন্মজন্মান্তরের রূপান্তরিত অসুর। চলতি অর্থে ইদুকে ভিলেন বললেও আসলে সে তা নয়। সে প্রকৃতিজাত এবং সর্পতুল্য। এই সংস্কৃতির মধ্যে সে শিকার ও শিকারীর যুক্তি খুঁজে পায়। অকাল, খরা, ঝড়, বৃষ্টি তাকে শোষণের অসীম ক্ষমতা যোগায়।[৪৭]

ইদুদের মত মানুষেরাই সার্থক হতে দেয়না বনশ্রী আর ডলিমনের স্বপ্ন। লাওয়াদের মেয়ে ডালিমন এক নিঃসঙ্গ নারী। সোনাইয়ের সঙ্গে দূর গাঁয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল ডালিমন। শেষ পর্যন্ত সোনাইয়ের হাতে খুন হয় ইদু কন্ডাক্টর। অন্যের প্রবৃত্তির কাছে সমর্পিতা বনশ্রী বালাও এণ্ডিন খেয়ে জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছে। নাটকে গ্রামীণ আবহ সৃষ্টি করতে নাট্যকার বাংলার লোক-সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন।

সাজেদুল আওয়ালের *ফণিমনসায়* ফুটে উঠেছে গ্রামীণ জীবনের প্রতিবিম্ব।[৪৮] কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে লেখা নাটকের মূল দ্বন্দ্ব জেলে সম্প্রদায়ের চরদখল। ফণিমনসা নামের নদীটি শুকিয়ে যাওয়ায় জেলে পাড়ায় হাহাকার পড়ে গিয়েছিল।

শুক্‌নো নদীর জন্য জেলেরাও জাত ব্যবসা ছেড়ে জমি চাষাবাদের কথা ভাবে। এজন্য চরদখলের পশ্ন আসে। বৃদ্ধ ছিদামের আতঙ্ক : "চরদখল করতে অনেক মানুষকে রক্ত দিতে হবে।" [পৃ. ১৩৪] কিন্তু তরুণ লাখাই ছিদাম বুড়োর কথা মানতে রাজি নয়। এরা বিশ্বাস করে অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হবে।

নাটকে পরিস্ফুটিত হয়েছে জেলেদের দুর্দশার বাস্তব চিত্র। অভাবের তাড়নায় জেলে পাড়ার মেয়েরা ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে। নদীর চরে আবার নতুন করে তারা ভাগ্য গড়ার স্বপ্ন দেখে। ইটখোলার মালিকরাও এই চরের একচ্ছত্র অধিকার দাবি করে।

তাদের পরামর্শ, জেলেরা দূরে কোথাও নদীর বুকে আবার তাদের জাত ব্যবসা শুরু করুক। কিন্তু নহলী চর দখল নিতে হলে ইট খোলার শ্রমিকদের সঙ্গে দাঙ্গা করে তা নিতে হবে। জেলেরা জানে নদীর অবস্থা দেশের সবখানেই একই রকম। তাই তারা দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত হয়। ইট খোলার শ্রমিকদের অবস্থাও খুব ভাল নয়।

একই সঙ্গে পাশাপাশি বেড়ে ওঠা দু'দল আজ জমি অধিকারের প্রশ্নে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। দাঙ্গার আগের দিন ইটখোলার প্রথম যুবক আসে মালো সম্প্রদায়ের কৃষ্ণর কাছে। স্মরণ করে তাদের বাল্যকালের স্মৃতি-বিজড়িত দিনের কথা। পরের দিন দাঙ্গায় ধীবর সন্তানরা একে-একে মৃত্যু বরণ করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এভাবে নিজেদের মধ্যে সংঘাত বাধিয়ে শক্তি ক্ষয় করছে। এ নাটকে রয়েছে সেই ইঙ্গিত।

বাংলাদেশের একটি দ্বীপাঞ্চলকে কেন্দ্র করে রচিত মামুনুর রশীদের নাটক *অববাহিকা*।[৪৯] এ নাটক রচনা প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেছেন :

> বহুদিন ধরে আমার ইচ্ছা ছিলো অববাহিকায় প্রাকৃত জনকে নিয়ে একটি নাটক লিখবো, যে নাটকে এই গাঙ্গেয় অববাহিকার প্রকৃতির সন্তানদের চরিত্র, সংগ্রাম, আশা, বেদনা থাকবে আর থাকবে একটি মেয়ে। এই মেয়েটিকে সবাই চেনেন, যে স্বজন হারানো বেদনায় উপর্যুপরি আঘাতে বোবা হয়ে গেছে।[৫০]

সাজেদা সেই বোবা মেয়ে। বিয়ের পর কোন এক আঘাতে তার বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে তার নীরব ভাষা তার প্রতিবাদ। মুখে কোন শব্দ উচ্চারিত না হলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদে সোচ্চার। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি বছর অববাহিকার মানুষ হারিয়েছে সম্পদ প্রিয়জন। দুর্যোগের সুযোগ গ্রহণ করে একশ্রেণীর সুবিধাবাদী দল। এদের একজন জামান। জামান থাকে শহরে। তার ব্যবসা গ্রামের মানুষকে ঘিরে। আদম ব্যাপারীর মত গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বাইরে পাঠায়। এদের মধ্যে বহু কষ্টে ফিরে আসে সানু। জামান মিয়ার প্রকৃত স্বরূপ এখন তার কাছে স্পষ্ট। গ্রামের লোকের কাছে তা তুলে ধরতে চাইলেও পারে না। কারণ ঐ সময় শুরু হয় মহাপ্লাবন। গ্রামের লোককে ফেলে জামান ও তার সঙ্গীরা নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে যায়। প্লাবনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সানু আর সাজেদা। দুর্যোগে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। এই দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার জন্য রহমান মাস্টারের উদ্যোগে বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়। এই বাঁধে জামানের স্বার্থহানি ঘটবে। তাই সে বাধা দিতে আসে। কিন্তু গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রতিবাদে ব্যর্থ হয়ে যায় তার সব প্রচেষ্টা। প্রতিবাদী চেতনা সঞ্চারের ক্ষেত্রে এ নাটকের ভূমিকা উল্লেখ করার মত।

শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব-প্রধান আরেকটি নাটক গোলাম আম্বিয়া নূরীর (জ. ১৯৪৮) *কুমারখালীর চর*।[৫১] ময়েজউদ্দি এবং ফয়েজউদ্দি দু'ভায়ের সংসারে বউ আসার পর পারিবারিক কোন্দলের কারণে দু'ভাই পৃথক হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের জমি জায়গা ভাগ হয়নি। বাড়িতে একটি কাঁঠাল গাছ, সেই গাছের কাঁঠাল পাড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'বৌ-এর ঝগড়া হলে ছোট বৌ-এর পরামর্শে ছোটভাই ফয়েজউদ্দি সম্পত্তি ভাগ করতে চায়। এদের বৃদ্ধ পিতা জমি ভাগাভাগি করতে বারণ করেন। তার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছেন, গ্রামের জোতদার মহাজনদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ থাকাটা খুবই প্রয়োজন। এ গ্রামের জোতদার মণ্ডলের অনেকদিনের আশা এদের জমির ফসল নিজের ঘরে তুলবে। এজন্য ফয়েজউদ্দির সঙ্গে নিজেরই

মনোনীত পাত্রী আসাফনের বিয়ে দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আসাফনকে আশ্রয় দিয়েছিল। এর পেছনে তার গভীর উদ্দেশ্য ছিল।

ক্রোধে উন্মত্ত মণ্ডল তার লোকজনকে দিয়ে ফয়েজউদ্দিদের ক্ষেতের ফসলে আগুন লাগিয়ে দেয়। গ্রামের সব চাষী যখন আগুন নেভাতে এগিয়ে যায় তখন আসাফনের ঘরে ঢুকে মণ্ডল। আসাফনের সম্মান রক্ষায় এগিয়ে আসে বড়বৌ। তার হাতে খুন হয় মণ্ডল। এর পরের ঘটনা খুব মর্মান্তিক যা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের কৃষকদের ভাগ্যের করুণ পরিণতিকে নির্দেশ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর জোতদারদের অন্যায়-অত্যাচারে শোষিত মানুষের জীবনের এ-ই শেষ পরিণতি। ময়েজউদ্দির একমাত্র সন্তান ফেরজার জীবন অকালে ঝরে যায়।

সমুদ্র-উপকূলীয় মানুষের জীবনধারা ও সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে নাট্যকার সেলিম আল দীনের নাটক *হাত হদাই* (১৯৯০)।[৫২] তরঙ্গের বিক্ষুব্ধতার মাঝে যেমন দক্ষ নাবিক যুদ্ধ করে চলে, তেমনি এই সব উপকূলীয় মানুষও জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত। 'হাত হদাই' কথাটি একটি বিশেষ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। এর আক্ষরিক অর্থ মাস সওদা বা সপ্ত বাণিজ্য। নাটকের প্রধান চরিত্র আনার ভাণ্ডারী। সে একজন প্রাক্তন জাহাজী। তার বয়স ষাটোর্ধ্ব। তরুণ বয়সে সে মায়ের গয়না চুরি করে কোলকাতার খিদিরপুর ঘাট থেকে পালিয়ে যায় অনিশ্চয়তার পথে। জাহাজে করে বহু বন্দর ঘুরে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তার চরিত্রে এনেছে অসীম ব্যাপকতা। তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প সে শোনায় গ্রামবাসীকে। কখনো গর্বভরে উচ্চারণ করে মাল্টা মিসিলের কথা। নিজের দেশের মোরগযুদ্ধ দেখে মনে পড়ে যায়, বাটাভিয়ায় দেখা মোরগযুদ্ধের কথা। আবার কখনো ছোট শ্যালিকা আঙ্গুরীকে শোনায় 'ডেলাগোয়া' সাগরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বলে আফ্রিকার গল্প। এই সব গল্প বলবার সময় আবেগে উত্তেজনায় সে যেন ফিরে পায় তার তারুণ্য।

নাটকের অন্য চরিত্রগুলি আনার ভাণ্ডারীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। নাটকে তাদের ব্যক্তিগত টানাপড়েন প্রেম দ্বন্দ্বে রূপ পেয়েছে। আছে প্রথম পক্ষের অকর্মণ্য পুত্র ছিদ্দা, স্নেহময়ী পুত্রবধূ বেগমী, দ্বিতীয় ঘরের ছন্নছাড়া পুত্র জামাল, পুত্রতুল্য মোদু, মোদুর প্রণয়ী হাস্না, বজল, বজলের দুখিনী বোন চুক্কনী আর ইদ্রিছ, নাড়ু লেদন, মালু হাবজের মত আরো অনেক চরবাসী। এদের প্রত্যেকের একটা আলাদা জীবন আছে, আলাদা স্বপ্ন আছে, আছে নিজস্ব একটা সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ঝড়ো হাওয়ার মুখে বিপন্ন জাহাজীর সংগ্রামের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাই এ নাটক সে অর্থে কোন ভ্রমণ কাহিনী না হয়েও যেন জীবন সংগ্রামের সমুদ্রে এক উত্তাল তরঙ্গ। আনার ভাণ্ডারী যেন অসীম প্রাণের ভাণ্ডার। এলাকাবাসীদের বলি খেলা কিংবা যে কোন আচার অনুষ্ঠানে আনারের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। অতীতের বিচিত্র স্মৃতি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই স্মৃতি তার বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। এজন্য শারীরিকভাবে অসুস্থ হলেও পুনরায় সে উঠে বসে এবং নতুন উদ্যমে নাচে-গানে মেতে ওঠে। যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার সাথে ঠাট্টা-মশকারা বা স্থূল রসিকতায় আনারের জুড়ি নেই। জীবনের প্রণোচ্ছলতার কারণে সে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবার কাছে সমান প্রিয়।

মাঝে মাঝে মৃত্যু চিন্তা তাকে ভাবিত করলেও ভীত করতে পারেনি। প্রাণের অসীম প্রাচুর্যের কারণে মৃত্যুকে সে অবজ্ঞা করেছে। এজন্য কাফনের কাপড় দিয়ে বানায় পাঞ্জাবি। নিজের কবর খুঁড়িয়ে চুপি চুপি তা আবার নিজেই বুজিয়ে দেয়। প্রতি বছর তৌবা করে আর ভাঙে। নামায পড়তে বসলে তার মনে পড়ে সমুদ্রে ভাসমান সেই রোমাঞ্চকর দিনগুলির স্মৃতি। এভাবে আনার প্রতিনিয়ত পরিহাস করছে মৃত্যুকে, পরকালকে। আনারের প্রাণসুধা সঞ্চারিত হয়ে যায় তার চেনা পরিচিতদের মাঝেও। যে সাদাসিধে নাড়ু কচ্ছপ শিকার করে কোনমতে পেট চালায়, দাদার দাহ-হওয়ার সাথে সাথে সমাজের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে প্রাণের দোসর রূপে গ্রহণ করে সীতা বৌদিকে। যে মালু হাবজ কতশত মৃত্যু পথযাত্রীকে ধর্মের বাণী শুনিয়েছে, সেই মালুই আবার মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। পৃথিবীর আলো-বাতাসে বেঁচে থাকবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। বেঁচে থাকার সুখটুকু উপভোগের জন্য প্রত্যেকেই তৃষ্ণার্ত। এ নাটকে মৃত্যুর বিভীষিকা, দুঃখ যন্ত্রণার কথাও আছে। জীবনযুদ্ধে কেউ জয়ী আবার কেউ পরাজিত। নাটকে ঘটনার ধারাবাহিকতা নেই। খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে চর অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা। নাটকে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের ফলে চরিত্রগুলি হয়েছে বাস্তবধর্মী। নোয়াখালির ভাষার সাথে যুক্ত হয়েছে বলিখেলা, ভেড়া বা মোরগের লড়াইয়ের মত ঐতিহ্যবাহী ক্রিয়াকলাপ; যাতে গ্রামবাংলার চিরন্তন রূপ উদ্ভাসিত।

গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের চিত্র এঁকেছেন আবদুল্লাহ আল মামুন *শাহজাদীর কালো নেকাব* (১৯৮৩) নাটকে।[৫৩]

গামছা ব্যবসায়ী আজমত বেপারী হঠাৎ করে ধনী হয়ে জমিদারি কিনে। আভিজাত্যের নির্মোক পড়বার জন্য বেপারী নাম ঝেড়ে ফেলে চৌধুরী নাম নেয়। তার ছেলেবেলার বন্ধু রিয়াজউদ্দীন মাস্টারকে বলে চৌধুরীদের চটকদার ইতিহাস তৈরি করতে। এর বিনিময়ে তাকে দেওয়া হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা।

বড় চৌধুরীর স্ত্রী কালো হওয়ায় সে চিরদিন স্ত্রীকে অবজ্ঞা করেছে। স্ত্রীর রঙ কালো হওয়ায় সে মনে করে এটা তার আভিজাত্যের পক্ষে বিরাট বাধা। চৌধুরী পরিবারে রূপের অভাব মেটানোর জন্য সে সিরাজউদ্দীন মাস্টারের একমাত্র রূপসী মেয়ে নাদিরাকে একরকম জোর করে পুত্রবধূ করে ঘরে আনে। নাদিরা ছিল তার বাবার সুযোগ্য ছাত্র আনিসের বাগদত্তা। আনিস ছোট চৌধুরীর বন্ধু। বাবার প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না ছোট চৌধুরীর. বিত্তবান বাবার কদর্য রূপটাই সে দেখেছে এতকাল। তাই বাবার উপর প্রতিশোধ নিতে সে তিলে তিলে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। বড় চৌধুরীর মৃত্যুর পর চৌধুরীমঞ্জিল ছাড়া জমিদারির কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

দীর্ঘ সাত বছর পর আনিস আসে এ গ্রামে। সে চৌধুরীমঞ্জিল কিনে নিতে চায়। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য সে চৌধুরী বাড়ির ছোট বৌ নাদিরাকে নাচতে বলে জলসাঘরে। কেবল এই শর্তে চৌধুরীমঞ্জিল রক্ষা পাবে। নর্তকীর বেশে নাদিরা নাচঘরে এলে তার মুখে থাকে কালো নেকাব। নেকাব সরিয়ে দিতে দেখা যায় রূপসী নাদিরার এসিডে অর্ধদগ্ধ মুখ। এভাবেই অপমানের প্রতিশোধ নেয় সে। প্রধান চরিত্র ছোট চৌধুরী। ছোট চৌধুরীর চরিত্রে যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে।

কোন কিছুকে জীবনে সে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। পিতার অপরাধ তাকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। মায়ের উপরে পিতার অত্যাচার তাকে আরো দগ্ধ করেছে। একারণেই সুন্দরের প্রতি ছিল তার তীব্র ঘৃণা, যা ছিল নাদিরার সঙ্গে স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনের প্রধান বাধা। এসিডদগ্ধ নাদিরা তার বেশি আপন।

মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালে যে সব নাটক রচিত হয়েছে, সেখানে ঐতিহ্য সন্ধানে নাট্যকাররা অনেক ক্ষেত্রে গ্রামীণ যাত্রা বা পালার আশ্রয় নিয়েছেন। এ ধরনের একটি নাটক মমতাজ উদ্দীন আহমদ-এর *রাজা অনুস্বারের পালা* (১৯৮৭)।[৫৪] রাখালের বাঁশি, পালাগান, ঢোল বাদক এসব কিছু গ্রামীণ জীবনের পরিচয় বহন করে। আশির দশকের নাট্যকারদের গ্রামীণ পটভূমি আশ্রয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশজ ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. হুমায়ুন কবির, *বাঙলার কাব্য*, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬৫, পৃ. ৩৮

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

৩. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ সম্পাদিত,, *ইবরাহীম খাঁ রচনাবলী*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

৪. নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৪১৩

৫. *ইবরাহীম খাঁ রচনাবলী*, পূর্বোক্ত

৬. আবিদ আজাদ ও মাহবুব হাসান সম্পাদিত, *আসকার রচনাবলী*,১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯২

৭. পূর্বোক্ত।

৮. পূর্বোক্ত।

৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৬৯৭

১০. *শেষ অধ্যায়*, ঢাকা, ১৯৭০

১১. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

১২. হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নাটকসমগ্র*, ঢাকা, ১৯৯৬

১৩. পূর্বোক্ত। 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকটি প্রথমে 'একটি বিচারকের কাহিনী' নামে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা *সংলাপ* -এ দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৪. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩, পৃ. ৪৫৩

১৫. *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নাটকসমগ্র*, পূর্বোক্ত।

১৬. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক*, মুক্তধারা, ঢাকা , ১৯৯০, পৃ. ৯৩

১৭. হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নাটকসমগ্র* , পূর্বোক্ত, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১৮. *আসকার রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত।

১৯. পূর্বোক্ত।

২০. আনিস চৌধুরী, *মানচিত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা , ১৩৭০

২১. রফিকুল ইসলাম, 'পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন মঞ্চ ও অভিনয়', সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত, মাসিক *সমকাল*, ঢাকা, কার্তিক ১৩৬৫, পৃ. ১৯৬

২২. আজিমউদ্দীন আহমদ, *মা*, ঢাকা, (প্রকাশকাল উল্লেখ নেই)।

২৩. ফররুখ শিয়র, *সামনের পৃথিবী*, পাবনা, ১৯৬০

২৪. ১৯৫৩ সালে নাটকটি পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২৫. আলী মনসুর, *পোড়োবাড়ী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬

২৬. *সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬

২৭. পূর্বোক্ত।

২৮. মুহম্মদ মজিরউদ্দিন, *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা*, রাজশাহী, ১৯৭০, পৃ. ৩১৮

২৯. ১৯৫০ সালে লোকনাট্যটি প্রথম প্রকাশিত হয়। দুটি অংশে বিভক্ত, এ গ্রন্থের প্রথম অংশে 'পদ্মাপার' এবং দ্বিতীয় অংশে নাট্যকারের সংগৃহীত ও স্বরচিত কিছু গান সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

৩০. জসীমউদ্‌দীন, 'আমাদের লোকনাট্য', *জসীমউদ্‌দীনের প্রবন্ধসমূহ*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯০

৩১. জসীমউদ্‌দীন, *বেদের মেয়ে*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮

৩২. জসীমউদ্‌দীন, *ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়*, ৪র্থ সংস্করণ, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১২

৩৩. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮

৩৪. আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, *ত্রিমাত্রিক*, ঢাকা, ১৯৬৬

৩৫. দীনেশচন্দ্র সেনকে ১৯২৪ সালের ১৪ মার্চ লেখা পত্রে তা উল্লেখ আছে। দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ৫ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯২৭, পৃ. ৭৯১

৩৬. *আসকার রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত।

৩৭. পূর্বোক্ত, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩৮. সাঈদ আহমেদের তিনটি নাটক, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩৯. সৈয়দ শামসুল হক, *কাব্যনাট্য সংগ্রহ*, ঢাকা, ১৯৯১

৪০. পূর্বোক্ত।

৪১. মুক্তধারা ৫ম প্রকাশ,. ঢাকা , ১৯৮৯

৪২. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

৪৩. মামুনুর রশীদ, *এখানে নোঙর*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪

৪৪. মুক্তধারা, ঢাকা , ৩য় প্রকাশ. ১৯৯৩

৪৫. *উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক, ঢাকা ,এপ্রিল-জুন, ১৯৮৫

৪৬. *থিয়েটার*, ১১শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, ঢাকা, মার্চ ১৯৮৫

৪৭. সেলিম আল দীন, *তিনটি মঞ্চনাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪৮. *উত্তরাধিকার*, পূর্বোক্ত, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৮৫

৪৯. মামুনুর রশীদ, *অববাহিকা*, মুক্তধারা, ঢাকা , ১৯৮৬

৫০. পূর্বোক্ত, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৫১. শিল্পকলা একাডেমী. ঢাকা, ১৯৮১

৫২. *থিয়েটার*, সম্পাদক: রামেন্দু মজুমদার. ১৬শ বর্ষ, ১ম-২য় যুগ্ম সংখ্যা. আগস্ট ১৯৯০

৫৩. মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩

৫৪. মুক্তধারা, ঢাকা , ১৯৮৭